ধান শুধু ধান

অরুণ মিত্র

অরুণ মিত্র

দি বুক ট্রাস্ট
৫৭-বি, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক ঃ
অসীমকুমার মুখোপাধ্যায়,
৫৭-বি কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ—জুন ১৯৮৭

মূল্য ঃ সাতাশ টাকা মাত্র

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীস্বপন কোলে
নিউ মুদ্রণী
৭১, কৈলাস বোস স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

আমার কথা

পশ্চিমবঙ্গ কৃষিপ্রধান রাজ্য। এখানকার শতকরা সত্তরজন গ্রামের মানুষ কোন-না-কোন প্রকারে কৃষির উপর নির্ভরশীল। উন্নত প্রযুক্তি-বিদ্যা প্রয়োগের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গকে শুধুই স্বয়ম্ভর করতে নয়, উপরন্তু রপ্তানিযোগ্য উদ্বৃত্ত ফসলের দ্বারা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচীকে ব্যাপক আকারে বিস্তার করতে সরকারী প্রচেষ্টা উৎসাহব্যঞ্জক। এই প্রচেষ্টার মূল কেন্দ্রস্থল হল গ্রাম-পর্যায় কৃষি প্রযুক্তিকে প্রয়োগ করা। রাজ্য সরকারের কৃষি বিভাগ সেজন্য গ্রাম্যস্তরে কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক নিয়োগ করেছেন। এই কৃষি কর্মীরা নিয়মিত নির্দিষ্ট দিনে গ্রামের কৃষকদের উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ পদ্ধতি হাতে কলমে শিখিয়ে দেন। এর মাধ্যমে কৃষকেরা নতুন তথ্যের সাথে পরিচিত হবার সুযোগ পাচ্ছেন।

কৃষি প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর সংস্পর্শে আসার সুযোগে ও কৃষি প্রযুক্তি সহায়কদের সাথে আলাপ আলোচনায় এই মনোভাব প্রকাশ পায় যে, যদি উন্নত কৃষি প্রযুক্তির কথা বিস্তারিত ভাবে সহজ ভাষায় পুস্তক আকারে লেখা থাকে তাহলে কৃষি কর্মীদের কাজের সুবিধা হয়। এই বিষয় সর্বপ্রথম আমায় প্রেরণা দেন শ্রীশিশিরকুমার চক্রবর্তী। তিনি পুস্তকের ভাষা সংশোধন, শব্দ যোজনা ও সম্পাদনার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে না নিলে এ বই লেখা আমার পক্ষে সম্ভব হত না। চুঁচুড়া ধান্য গবেষণা কেন্দ্রের কৃষিবিদ্ শ্রীঅমরনাথ রায় সর্বস্তরে সুপরামর্শ দিয়ে এই প্রচেষ্টাকে সমৃদ্ধ করেছেন। এইভাবে সাহায্য ও অনুপ্রেরণা দিয়ে উভয়েই আমায় কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

বইটি গ্রাম্যস্তরে প্রযুক্তি সহায়কদের ও কৃষকদের উপকারে লাগলে আমার পরিশ্রম সার্থক হবে। পুস্তকটি পশ্চিমবঙ্গ কৃষক ও কৃষি কর্মীদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হল।

অরুণ মিত্র

মতামত

শ্রীঅরুণ কুমার মিত্রের লেখা 'ধান শুধু ধান' বইটি পড়ে দেখলাম। বাংলায় লেখা কৃষি প্রযুক্তিবিদ্যার বই খুবই কম চোখে পড়ে। সেদিক থেকে শ্রীমিত্র বাংলায় এ ধরনের একটি বই লেখার কাজে হাত দিয়ে, বলতেই হবে, বেশ সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। কৃষি প্রযুক্তিবিদ্যার বই বাংলা ভাষায় যত লেখা হয় ততই মঙ্গল। যাঁদের কৃষি প্রযুক্তি সম্বন্ধে জানার ইচ্ছা প্রবল, অথচ ইংরেজীতে লেখা বই পড়তে অভ্যস্ত নন এবং সে ধৈর্যও নেই তাঁরা এ ধরনের বই পড়ে অবশ্যই উপকৃত হবেন।

বইটি যে বিশেষ ভাবে আধুনিকতথ্যসমৃদ্ধ তা স্বীকার করতেই হবে। বাংলায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা সম্পর্কিত বই লেখা অপেক্ষাকৃত কঠিন। তাই ভাষার দিক থেকে কিছু জড়তা বা জটিলতা বা কাঠিন্য থাকলে, সেদিকে তত চোখ-কান না দেওয়াই ভাল। বক্তব্য বিষয় পরিষ্কার করার জন্য যেসব ছবি সারণী ও লেখচিত্র দেওয়া হয়েছে তাতে ভাষার কাঠিন্যগত ত্রুটি অনেকাংশে বিদূরিত হবে বলেই আমার ধারণা। বইটিতে চুঁচুড়া ধান্য গবেষণা কেন্দ্র থেকে উদ্ভূত ধানগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এই সংযোজনে বইটির গুরুত্ব যে উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, সে সম্বন্ধে কোন দ্বিমত নেই।

মাঠে-ঘাটে যে সব কৃষি প্রযুক্তি সহায়কেরা কাজ করছেন, বইটি তাদের প্রশিক্ষণ পরিদর্শনের কাজে বিশেষ সাহায্য করবে বলেই আমার ধারণা। উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের (ভোকেসানাল স্ট্রীমের) ছাত্র-ছাত্রীরা বইটি পড়ে উপকৃত হবে। গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে যুক্ত গ্রামসেবকরা বইটি পড়ে ধান চাষের আধুনিক প্রযুক্তি সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন। এমনকি, যাঁরা স্নাতক পর্যায় কৃষি বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রী, তারাও বইটি পড়ে উপকৃত হবেন। আমি বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

ধান্য গবেষণা কেন্দ্র,
চুঁচুড়া
জুন ১৯, ১৯৮৭

শ্রীবাদল কুমার মণ্ডল
যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা (ধান্য)

মতামত

আমাদের দেশে উচ্চফলনশীল ধান চাষের প্রবর্তন হয় মধ্য-ষাটের দশকে। সেই সময় থেকে ধান উৎপাদনের ক্ষেত্রে দ্রুত প্রসার ও প্রাসঙ্গিক পট পরিবর্তন হয়ে চলেছে, যার স্পন্দন আজ অস্পষ্ট নয়। বিংশ শতাব্দীর মোহানায় দাঁড়িয়ে দেখা যায় যে আধুনিক প্রযুক্তিগত তথ্যের ঘাটতি না থাকলেও মাতৃভাষায় তাদের সহজবোধ্য সংকলের যথেষ্ট অভাব। যুগ প্রয়োজনে লিখিত "ধান শুধু ধান" সেই ঘাটতি পূরণের একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হিসেবে গৃহীত হবে—এই আশা নিয়ে লেখকের প্রতি অভিনন্দন জানাই।

জুন ১২, ১৯৮৭

অমরনাথ রায়, কৃষিবিদ্
ধান্য গবেষণা কেন্দ্র, চুঁচুড়া

মতামত

"ধান শুধু ধান" বইটি ধান চাষ-এর সাথে যাঁরা যুক্ত তাঁদের জন্য একটি সময়োপোযোগী বই। বইটি সুন্দর করে লেখা এবং তথ্যবহুল। এই রকম একটি বই-এর প্রয়োজন ছিল।

আশা করি, সকলের কাছে এই বই গ্রহণযোগ্য হবে। লেখক তার ব্যবহারিক জ্ঞান ও দীর্ঘ অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে বইটি লিখেছেন। বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

জুন ২৫, ১৯৮৭

সুজিত দত্ত
মুখ্য কৃষিবিদ্ ও যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা
বর্ধমান

মতামত

শ্রীঅরুণ কুমার মিত্র রচিত "ধান শুধু ধান" বইখানি পড়ে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। লেখক পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ক্ষেতে খামারে ঘুরেছেন। প্রায়োগিক কৃষির উপর গবেষণা করেছেন, শস্যরক্ষণ বিষয়ে কাজ করে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন এবং কৃষি শিক্ষণ কেন্দ্রে ছাত্র পড়িয়েছেন। এই বইটি শ্রীমিত্রের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাসঞ্জাত ফসল। আমি বিশেষ করে ধানের কীট-পতঙ্গ বিষয়ক অধ্যায়টি দেখেছি। এই দুরূহ বিষয়টি সুলিখিত এবং এটি পাঠকদের বিভিন্ন কীট-পতঙ্গ চিনতে, ক্ষতির লক্ষণ ও ব্যাপকতা সম্পর্কে অবহিত হতে এবং সর্বোপরি সুসংহত দমন পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা আনতে সাহায্য করবে।

আমি বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

চুঁচুড়া, ১৭ই জুন, ১৯৮৭

পুণ্যব্রত চট্টোপাধ্যায়
কীটতত্ত্ববিদ, ধান্য গবেষণা কেন্দ্র
চুঁচুড়া, হুগলী

ধান গবেষণার সাংগঠনিক রূপরেখা

আন্তর্জাতিক স্তরে :

আন্তর্জাতিক ধান্য গবেষণা সংস্থা (ইরি), লস বেনস, ম্যানিলা, ফিলিপিনস্ : এই সংস্থা সারা বিশ্বের ধানের উপর গবেষণায় রত। এই সংস্থায় ৩৭ হাজারের উপর বিভিন্ন জাতের ধানের সংগ্রহ রক্ষিত আছে। সংস্থাটি উন্নতমানের বীজের উদ্ভাবন প্রজনন, কীট ও রোগ জনিত ক্ষতির সহনশীলতা ও অন্যান্য সমস্যা সমাধানে নিয়োজিত। এই সংস্থা বিভিন্ন দেশে ও সংস্থায় বিজ্ঞানী পাঠিয়ে স্থানীয় সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে থাকেন। ইহা ব্যতীত বিভিন্ন দেশে উন্নতমানের বীজ প্রেরণ করা হয় এবং বিভিন্ন দেশের নিজস্ব গবেষণায় সাহায্য করা হয়ে থাকে।

জাতীয় স্তরে :

কেন্দ্রীয় ধান্য গবেষণা সংস্থা, কটক : এই সংস্থা সারা ভারতের ধান চাষের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে গবেষণা করে থাকে। ধানের বীজ উদ্ভাবন, বপন, সারব্যবহার, চাষপদ্ধতি, কীট ও রোগ দমন, বীজ সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া হায়দ্রাবাদে আছে ডাইরেকটোরেট্ অব রাইস রিসার্চ। এই সংস্থা দেশের বিভিন্ন রাজ্যের ধান্য উৎপাদন, গবেষণা ইত্যাদির জন্য কেন্দ্রীয় সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করতে সাহায্য করে। এই সংস্থা বিভিন্ন রাজ্যের গবেষণার ফলাফল ইত্যাদির মূল্যায়নে সাহায্য করে।

রাজ্য স্তরে :

চুঁচুড়াস্থিত (হুগলী) ধান্য গবেষণা কেন্দ্র রাজ্যের ধান্য গবেষণার দায়িত্বে নিযুক্ত। এই কেন্দ্রের আরও ৩টি শাখা আছে : পার্বত্য অঞ্চলের গবেষণার জন্য কালিংপঙে, খরাপ্রবণ এলাকার জন্য পুরুলিয়ার

হাতোয়ারায় ও ডাঙ্গা জমির জন্য বাঁকুড়ায়। শাখা সংস্থাগুলি নিজ নিজ এলাকার ধান গবেষণার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকে। তাছাড়া অঞ্চলভিত্তিক গবেষণার জন্য, মালদা, মোহিতনগর (জলপাইগুঁড়ি), কৃষ্ণনগর ও নলহাটিতে জোনাল এ্যাডাপটিভ রিসার্চ স্টেশন আছে।

প্রতিটি মহকুমাতে এ্যাডাপটিভ রিসার্চ ফার্মের পরিচালনাধীন একটি করে গবেষণা খামার আছে। ঐসব খামারে মহকুমার ধানচাষের বিভিন্ন এলাকাভিত্তিক সমস্যা সমাধানের জন্য গবেষণা করা হয়ে থাকে। তাছাড়া বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা শাখায় সরকারী সহায়তায় ধানচাষের নানা প্রযুক্তি সম্বন্ধে গবেষণা করা হয়।

সরাসরি কৃষকদের মাঠে গবেষণা করার জন্য পাণ্ডুয়াতে (হুগলী) অপারেশানাল রিসার্চ প্রোজেক্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্থানীয় চাষীদের কৃষি প্রযুক্তিগত সমস্যার স্বরূপ নির্ধারণ এবং চাষীদের সহায়তায় ঐসব সমস্যার সমাধানই এই সংস্থার উদ্দেশ্য।

সূচীপত্র

ধান শুধু ধান

১। উৎপত্তি ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ঃ

ভারতীয় শাস্ত্রমতে ভগবান বিষ্ণু মাতা ধরিত্রীকে ধান জন্মাতে বলেন আর স্বর্গের দেবতা ইন্দ্রকে বলেন পৃথিবীর মানুষদের ধান ফলানর কৌশল শেখাতে। এদেশের মানুষ তাই ধানকে ঈশ্বরের দান হিসাবে গ্রহণ করেছে। বালি দ্বীপের উপকথায় জানা যায় যে, জল ও উৎপাদনের দেবতা বিষ্ণু পৃথিবীতে এসেছিলেন পৃথিবীর মানুষদের ভাল খাবার দেবার জন্য ; কারণ তারা একমাত্র আখের রস খেয়ে বেঁচে থাকত। আজও ইন্দোনেশিয়ার বালি প্রভৃতি অঞ্চলের কৃষকেরা ভাল ধানচাষী হিসাবে সম্মানিত হন।

জাপানে ধানকে সম্রাটের পরেই সম্মান দেখান হয়। আজও বাৎসরিক উৎসবে দেশের সম্রাট ধান লাগিয়ে উৎসবের উদ্বোধন করে থাকেন।

দ্বাদশ শতাব্দীতে সিংহলের (বর্তমান শ্রীলঙ্কা) সম্রাট পরাক্রম-বাহু বলে গেছেন, "আমার রাজ্যে বহু জায়গায় বৃষ্টির জলে ধান চাষ হয়, কেউ নদী-নালার জলের সাহায্যে চাষ করেন। আবার কেউ ছোট ও বড় জলাশয়ের জলে চাষ করেন। রাজ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চল পাথর ও বন-জঙ্গলে ঢাকা। প্রতি বিন্দু বৃষ্টির জল মানুষের সেবায় নিয়োজিত করতে হবে, সমুদ্রে পড়তে দেওয়া হবে না।" তাঁর এই উক্তিতে প্রকাশ পায় যে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ এবং ফসল চাষ সম্পর্কিত জ্ঞান তখনকার কৃষকদের জানা ছিল। কি সম্রাট কি সাধারণ চাষী সকলেরই মাটি, জলের উৎস, জল-সংরক্ষণ ও ব্যবহার, জমির প্রকারভেদ ইত্যাদি সম্পর্কে ব্যবহারিক জ্ঞান প্রচুর ছিল ও তার ফলে তাঁরা সবিশেষ লাভবান হতেন। অন্যান্য তথ্য থেকে জানা যায় যে পুরাকাল থেকেই সমগ্র এশিয়ার কৃষকেরা মাটি, জল, পরিবেশ সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত ছিলেন, এবং সেই জ্ঞান ধানচাষের কাজে প্রয়োগ করে ফলন বৃদ্ধির চেষ্টা করতেন।

২। আবহাওয়া তত্ত্ব ও কৃষিকর্ম ঃ

জমি থেকে কোন ফসলের বিবিধ উপাদান প্রয়োগের সুব্যবহার ও প্রত্যাশিত ফলন পাবার জন্য ফসলোপোযোগী পরিবেশ সম্বন্ধে একজন কৃষকের একটি পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকা দরকার। যথা—

- প্রকৃতি ; যেমন—জলবায়ু, আবহাওয়া, মাটি ও জৈবিক পরিবেশ।
- উন্নত চাষ পদ্ধতি, যেমন—জমি তৈরী, পরিমিত সার প্রয়োগ, আগাছা নিবারণ, সুষ্ঠু জলের ব্যবহার, রোগ-পোকার দমন ইত্যাদি।

ধান উৎপাদনে জলবায়ুর প্রভাব জানতে হলে জলবায়ু ও আবহাওয়া সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা দরকার।

আবহাওয়া বলতে বোঝায়, কোন একটি জায়গার বা ছোট এলাকার একটি স্বল্পকালীন সময়ের (সামান্য কয়েক ঘণ্টা থেকে ১—২ সপ্তাহকাল) পরিবেশের উপাদান যেমন—তাপ, আর্দ্রতা, বায়ুর চাপ, গতি ও অবস্থা সম্বন্ধে তথ্য। যেমন—চাঁদে কোন প্রকারের পরিবেশ নেই সেই কারণে ওখানে আবহাওয়া বলে কিছু নেই। আবহাওয়া দৈনন্দিন পরিবেশ সম্বন্ধে তথ্য দেয় ও সদা পরিবর্তনশীল। জলবায়ু হল আবহাওয়ার বিভিন্ন উপাদানের দীর্ঘকালের গড়ের (৩০ বৎসর বা ৫০ বৎসর) সারাংশ। জলবায়ু যে কোন ফসলের বংশ বৃদ্ধির উপর প্রভাব বিস্তার করে। এই কারণে সম্ভাব্য ফলন পাওয়ার জন্য ওই ফসলের উপর জলবায়ু ও আবহাওয়ার কি কি প্রভাব পড়ে তার বিস্তারিত তথ্য থাকা প্রয়োজন।

২.১ বৃষ্টিপাত ঃ ধান চাষ মূলতঃ বৃষ্টি-নির্ভরশীল। যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে বিভিন্ন সেচ উৎস বৃষ্টির অভাব পূরণ করে। হিয়ুক[১] (১৯৭৬) বৃষ্টিকে প্রাধান্য দিয়ে পরিবেশ অনুযায়ী বিশ্বের ধান অঞ্চলকে চার ভাগে বিভক্ত করেছেন ঃ

---

(১) হিয়ুক. আই. আর. আর. আই প্রকাশন ১৯৭৬ ধান, মাটি ও জল পৃঃ ৩৬।

ক। যেখানে প্রয়োজনীয় বৃষ্টি হয় না, কেবলমাত্র একটি ফসল করার ঝুঁকি নেওয়া যায়।

খ। যেখানে গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ধানচাষের পক্ষে অনুকূল কিন্তু তা কখনও নির্ধারিত সময়ে বা পরিমাণ মত হয় না বলে সেচের সাহায্য লাগে।

গ। যে অঞ্চলে স্বল্প বৃষ্টিপাতের জন্য ধান উৎপাদন সফল করতে সেচ আবশ্যক।

ঘ। অতি অল্প বৃষ্টিপাতের জন্য যে অঞ্চলে ধানচাষ খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়।

২.২ সূর্যের বিকিরণ: উদ্ভিদ তার শারীরগত বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি আহরণ করে সূর্যের বিকিরণ থেকে। এই বিকিরণ পরিমাপের একক হল ক্যালরি। পাইরেলিওমিটার যন্ত্রের সাহায্যে এই বিকিরণ মাপা যায়।

২.৩ দিবাকাল: ঊষাকাল থেকে গোধূলি পর্যন্ত সময়কে দিবাকাল বলে।

২.৪ তাপমাত্রা বা টেম্পারেচার: ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থার্মোমিটার যন্ত্রে মাপা হয়। স্টিভেনসন্স স্ক্রিন নামে একটি বাক্সের মধ্যে এই থার্মোমিটার রাখা হয়। থার্মোগ্রাফ্ যন্ত্রের সাহায্যে স্বয়ংক্রিয় ভাবে তাপমাত্রা মাপা যায়। ফসলের শারীরিক বৃদ্ধি ও ফলনের উপর তাপমাত্রার প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ।

২.৫ বাতাসের আদ্রর্তা: হাইগ্রোমিটার বা সাইক্রোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে বাতাসের আদ্রর্তা মাপা হয়। হাইগ্রোমিটার যন্ত্রের স্বয়ংক্রিয় ভাবে আদ্রর্তা মাপা হয়। থার্মোহাইগ্রোগ্রাফ যন্ত্রে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাপমাত্রা ও আদ্রর্তা মাপা হয়। কোন নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় শতকরা ১০০ ভাগ আদ্রর্তার অনুপাতে কতভাগ আদ্রর্তা ওই সময় বায়ুমণ্ডলে আছে তাকে আনুপাতিক আদ্রর্তা বলে। বাতাসের আদ্রর্তা ফসলের

বিভিন্ন শারীর বৃদ্ধির অবস্থার উপর প্রভাব ফেলে। রোগ ও পোকার আক্রমণ ও বংশ বৃদ্ধির উপর আর্দ্রতার প্রভাব আছে।

২.৬ **বায়ুপ্রবাহ বা উইণ্ড**ঃ গতিময় বাতাসকে বায়ু বলে এবং উহার গতি কিলো ঘণ্টায় প্রকাশ করা হয়। সামুদ্রিক বায়ুর গতি নট/ঘণ্টায় প্রকাশ করা হয়। এনিমোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে ওই সময়ে বায়ুর গতি জানা যায়। এনিমোগ্রাফের সাহায্যে ২৪ ঘণ্টার বায়ুর গতি স্বয়ংক্রিয় ভাবে মাপা যায়। বাষ্পীভবন, বাষ্পীমোচন ও অন্যান্য শারীরবৃত্তীয় কার্য বায়ুপ্রবাহের দ্বারা প্রভাবিত হয়।

৩। **গ্রীষ্মমণ্ডলের জলবায়ু এবং ধানের উপর তার প্রভাব**ঃ

জলবায়ুর উপাদানসমূহ যেমন তাপ, সূর্যের আলোক, বৃষ্টিপাত ধানগাছের বৃদ্ধি ও ফলনে দুইভাবে প্রভাবিত করে।

৩.১.১ **সরাসরি** এরা শরীর গঠনে বিশেষ করে শস্যদানা তৈরী করতে প্রভাবিত করে যেমন, জৈবিক উন্নয়ন, শীষ গঠন ও দানা পুষ্ট করতে।

৩.১.২ **অপ্রত্যক্ষ ভাবে** রোগ ও পোকার আক্রমণ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে ; ফলে উৎপাদন হ্রাস পায়।

৩.২ কৃষি বিজ্ঞানীরা ফসল চাষের সময়কাল, উৎপাদন ক্ষমতা ও স্থিতিশীলতার উপর সব থেকে বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন।

৩.২.১ **ফসলের সময়কাল**ঃ গ্রীষ্মমণ্ডলের তাপমাত্রা প্রায় সারা বৎসর ধানচাষের পক্ষে উপযোগী—যেখানে সেচের সুযোগ নেই সেখানে কেবল বর্ষাকালে বা বৃষ্টির সুযোগ নিয়ে ধানচাষ হয়।

৩.২.২ **উৎপাদন ক্ষমতা**ঃ গ্রীষ্মমণ্ডলে হেক্টর প্রতি (৭½ বিঘা ঃ ৩৩ শতকে এক বিঘা) উৎপাদন ক্ষমতা মূলতঃ নির্ভর করে সূর্যকিরণের সম্ভাব্য প্রতিফলন কি ও কতটা পাওয়া যায় তার উপর। এই অঞ্চলে ভাল পরিচর্যা করলে গ্রীষ্মকালে (যখন সূর্যের রশ্মি বেশী সময় পাওয়া যায়) বর্ষাকালের তুলনায় (যখন সূর্যরশ্মি কম পাওয়া যায়) বেশী ফলন পাওয়া যায়।

৩.২.৩ **ফলনের স্থিতিশীলতা ঃ** গ্রীষ্মমণ্ডলে ধানগাছের জীবনকালের যে কোন অবস্থায় কম বৃষ্টি বা বেশী বৃষ্টি ফলনের আংশিক বা সম্পূর্ণ ক্ষতি করতে পারে।

৪.১ **তাপমাত্রা ঃ** ইহা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ইহা ধান লাগান থেকে ফসল কাটা পর্যন্ত কৃষিকার্যকে কোন-না-কোন প্রকারে প্রভাবিত করে। ধানগাছের বৃদ্ধির প্রতিটি স্তরে কম বা বেশী ক্ষতিকারক এবং সম তাপমাত্রা নির্ধারিত আছে। সাধারণভাবে বলা যায় ২০° সেলসিয়াস, তাপমাত্রার নিম্নসীমা এবং ৩০° সেলসিয়াস উচ্চসীমা। গাছে ফুল আসার পরে তাপমাত্রার ভূমিকা থাকে। সুতরাং ঐ অঞ্চলে ফুল আসা থেকে ৩০ দিন পর্যন্ত তাপমাত্রার গুরুত্ব বেশী।

৪.২ গাছের বৃদ্ধির সাথে তাপমাত্রার প্রতিফলন ঃ

*গাছের বৃদ্ধির অবস্থা	ক্ষতিকারক তাপমাত্রা °সেলসিয়াস		
	নিম্নতম	উচ্চতম	উপযুক্ত বা সম
১ অঙ্কুর হওয়া	১৬—১৯	৪৫	১৮—৪০
২ চারা বেরোন ও বৃদ্ধি	১২—৩৫	৩৫	২৫—৩০
৩ শিকড় বেরোন	১৬	৩৫	২৫—২৮
৪ পাতার বৃদ্ধি	৭—১২	৪৫	৩১
৫ পাশকাঠি ছাড়া	৯—১৬	৩৩	২৫—৩১
৬ ভ্রূণ সৃষ্টি (পি. আই.)	১৫	—	—
৭ ভ্রূণ থেকে শীষের বৃদ্ধি	১৫—২০	৩০	—
৮ ফুল ফোটা ও পরাগ মিলন	২২	৩৫—৩৬	৩০—৩৩
৯ পাকা	১২—১৮	৩০-এর বেশী	২০—২৯

*যোশিদা ১৯৭৭

তাপমাত্রার প্রভাব বীজ অংকুরিত হবার সাথেই শুরু হয় এবং তাপ বৃদ্ধির সাথে গাছের বৃদ্ধির হারও বেশী হয়। পরের দিকে (বোনার ২০—৩৫ দিন পরে) তাপমাত্রার প্রভাব কমে যায়। আবার বংশ বৃদ্ধির সময় ২২°—৩৩° সেলসিয়াস ও তার বেশী তাপমাত্রায় শীষের সংখ্যা কমতে থাকে।

---

*যোশিদা : আই. আর. আর. আই. প্রকাশন ১৯৭৭

ফুল আসবার ৯ দিন আগে নিম্ন তাপমাত্রায় ধানগাছ সংবেদনশীল হয়ে ওঠে। এই কারণে শীতপ্রধান দেশে বা যখন তীব্র ঠাণ্ডা পড়ে এবং দিন ও রাতের তাপমাত্রা নিম্নতম সীমায় পেঁছায় তখন ফুলে পরাগমিলন সম্ভব হয় না ; ও শীষের ধান চিটা হয়। সাধারণতঃ দৈনিক গড় তাপ-মাত্রা ২০° সেলসিয়াসের নীচে হলে ধান চিটে হয়ে যায়।

সাটাকে ও যোশিদার (১৯৭৮)-র মতে ধান গাছে ফুল ফোটার সময় অধিক তাপমাত্রায় সংবেদনশীল হয়। দিনের তাপমাত্রা (বেলা ২টা থেকে ৪টা পর্যন্ত) ৩৫° সেলসিয়াসের ঊর্দ্ধে থাকলে পরাগ কেশর জ্বলে যায় অর্থাৎ ধান চিটে হয়ে যায়।

৫.১ **সূর্যের বিকিরণ :** পৃথিবীর অবস্থান অনুযায়ী সূর্যের কিরণ সর্বত্র সমান হয় না। ইতালীর মিলন-এ প্রতিদিন ৫০—৭০০ ক্যালরি প্রতি বর্গ সেণ্টিমিটার পায় ; তেমনি এমেরিকা মহাদেশের কেলিফোর্ণিয়াতে অধিকাংশ জায়গায় ধান পাকার সময় রোজ প্রতি বর্গ সেণ্টিমিটারে ৩০০ ক্যালরি পায়। এই অধিক বিকিরণ গড় উচ্চ ফলনের পক্ষে সহায়ক। স্পেন, পর্তুগাল বা এস্ট্রেলিয়ার মতন দেশে গড় উচ্চ ফলনের কারণ, ওখানে ধান পাকার সময় প্রতিদিন গড়ে ৭০০ ক্যালরি প্রতি বর্গ সেণ্টিমিটার জায়গায় সূর্যের বিকিরণ ধান গাছ পেয়ে থাকে। এদেশে ধান চাষ সাধারণতঃ বর্ষাকালে হয়। আকাশ বেশীর ভাগ সময় মেঘলা থাকে। পর্যাপ্ত ক্যালরি না পাওয়ার জন্য উচ্চফলন পাওয়া যায় না। এদেশের তিনটি আবহাওয়া বিজ্ঞান কেন্দ্রের তথ্য থেকে জানা যায় যে কটকে বিকিরণ সব থেকে কম পায় (প্রতিদিন ৩০০ ক্যালরি প্রতি বর্গসেণ্টিমিটার বিকিরণ হয়)।

৫.২ **ধান গাছের বৃদ্ধি :** ধান গাছের বৃদ্ধির উপর সূর্যের বিকিরণ বিভিন্নভাবে প্রতিফলিত হয়। অনুরূপ ভাবে বিকিরণের অভাবে যে ছায়া পড়ে তাতে গাছের বৃদ্ধি বা ফলনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কার্যকারী বিভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। জৈবিক বৃদ্ধির সময়

ছায়ার প্রভাব গাছের বৃদ্ধির উপর কোন প্রভাব ফেলে না। কিন্তু বংশ বৃদ্ধির অবস্থায় গাছের উপর ছায়া শীষের সংখ্যা ও দানার সংখ্যার উপর অত্যন্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

গাছের বৃদ্ধির বিভিন্ন অবস্থার উপর ছায়ার প্রভাব (ফলন ও ফলনের কার্যকারী অংশ)

সূর্যের বিকিরণ %	ফলন (টন/হেক্টর)	শীষের সংখ্যা (প্রতি বর্গ মিটার)	পুষ্ট দানার সংখ্যা (%)	১০০০ দানার ওজন (গ্রাম)
		জৈবিক অবস্থা		
১০০	৭·১১	৪১·৬	৪৮·৯	২০·০
৭৫	৬·৯৪	৪০ ৬	৪৯·৯	১৯·৯
৫০	৬·৩৬	৩৮·৩	৪৯·৫	১৯·৯
২৫	৬·৩৩	৩৮·১	৮৪·৩	১৯·৮
		বংশবৃদ্ধির অবস্থা		
১০০	৭·১১	৪১·৬	৮৮·৯	২০·০
৭৫	৫·৭১	৩০·৩	৮৭ ৮	২০·৩
৫০	৪ ৪৫	২৪·৪	৮৯·৪	১৯·৫
২৫	৩·২১	১৬·৫	৮৯·৪	১৯·১
		পাকার অবস্থা		
১০০	৭·১১	৪১·৬	৮৮·৯	২০·০
৭৫	৬·৫৩	৪১·১	৮১·১	২০·০
৫০	৫·১৬	৪০·৬	৬৪·৫	১৯·৫
২৫	৩·৯৩	৪১·৭	৫৪·৯	১৯·১

যোশিদা ও পারাও, ১৯৭৬

ধান পাকার সময় স্বল্পালোক ফলন কমায় ; কারণ ধানের চিটার সংখ্যা বেশী হয়।

৫.৩ সূর্যের বিকিরণের অভাব জৈবিক অবস্থায় অনুভূত হয় না ; কিন্তু পাকার সময় অপেক্ষা বংশ বৃদ্ধির সময় বিকিরণের স্বল্পতা বা ছায়ার প্রভাব উচ্চফলনে বেশী প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। বংশবৃদ্ধির সময় প্রতিদিন ২০০ ক্যালরি/বর্গসেণ্টিমিটার করে সূর্যের বিকিরণ

গাছ পেলে হেক্টর প্রতি ৪ টন ধান পাওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। ধান পাকার সময় যদি বিকিরণ কম পাওয়া যায় তাহলেও ঐ ৪ টন ধান পাওয়া সম্ভব। ভাল পরিচর্যা ও সময়োপযোগী শস্যরক্ষার ব্যবস্থা নিলে বর্ষাকালেও ৪ টন ফলন পাওয়া খুব কঠিন ব্যাপার নয়।

৬। বৃষ্টিপাত ও জলের চাহিদা ঃ

৬.১ জলের প্রয়োজন ঃ জল বা জলের চাহিদা জলবায়ু ও মাটির উপর নির্ভর করে। ফসল তার জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় জল মাটি থেকে সংগ্রহ করে। মাটির সঞ্চিত জল বাষ্পীভবন হয়। ফসল নিজে বাষ্পীমোচন করে ও এই দুইটির সমন্বয়কে বাষ্পীভবন ও বহিঃকরণ বলে। এই বাষ্পীভবন ও বহিঃকরণের মাত্রা, সূর্যের বিকিরণ, তাপ, বায়ুমণ্ডলের বাষ্পের অবস্থা ও বায়ুর গতির উপর নির্ভর করে।

৬.২ মাটির উৎপাদক ক্ষমতা ঃ ইহা ভূ-নিম্ন জলের স্তর, জমির অবস্থান ইত্যাদি সঞ্চিত জলের অপচয়ের সাহায্য করে। যেমন—(১) নীচের স্তরে নেমে যাওয়া, (২) চুঁইয়ে পাশে সরে যাওয়া ও জল বালু জমিতে বয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

৬.৩ কাণ্গ (১৯৭১) গবেষণালব্ধ তথ্য থেকে জানা যায় যে ধানের জীবন ধারণের জন্য দৈনিক জলের চাহিদা ৬-১০ মিমি একটি পূর্ণ জীবন চক্রের (বোনা থেকে কাটা পর্যন্ত) জন্য জলের চাহিদা ১২৪০ মিমি।

জলের অপচয়	জলের প্রয়োজন	
বাষ্পীমোচন	প্রতিদিন	১·৫—৯·৪ মিমি
বাষ্পীভবন	”	১·০—৬·২ ”
চুঁইয়ে যাওয়া	”	০·২—১৫·৬ ”
	মোট ”	৫·৬—২০·৪ ”

ফসল তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় জলের চাহিদা

বীজতলা	৪০ মিমি
জমি তৈরী	২০০ "
সেচ	১০০০ "
মোট	১২৪০ "

৭। কাকড়ে (১৯৮৫) তাঁর এগ্রিকালচারাল ক্লাইমেটোলজী পুস্তকে নিম্নলিখিত বিষয়ে আলোকপাত করেছেন ঃ

৭.১ জৈবিক অবস্থার জন্য গড় দিনের তাপমাত্রা ২০-৩৬ সে পরিষ্কার বা অল্প মেঘাবৃত আকাশ, বেশী সময়ে সূর্যের বিকিরণ, মাঝারি আর্দ্রতা ও রাত্রির তাপমাত্রা ১৯.৫—২২.৫°সে অত্যন্ত অনুকূল। সহনশীল তাপমাত্রা ১৯.০—৪০'সে কিন্তু শীষ বের হওয়া ও দানা তৈরীর জন্য দিনের তাপমাত্রা ২৯.৫—৩২.৫°সে ও রাত্রির তাপমাত্রা ১৯.০—২৩.০'সে অত্যন্ত ভাল বলেই গৃহীত। পাশকাঠি ছাড়ার সময় ৩২°সে অনুকূল বলেই বিবেচিত হয়। বোরো ধানের চাষের জন্য বীজতলা তৈরী করার জন্য নভেম্বর মাসই উপযুক্ত সময়। তখন নিম্নতম তাপমাত্রা ১.৭°সে কাছাকাছি থাকে।

৭.২ আলোর রশ্মি যখন সাধারণ মানের দুগুণ বা ২০০% হয় তখন পাশকাঠি, শীষের সংখ্যা ও পুষ্ট দানা অধিক সংখ্যায় বাহির হয়। বোরো ধান চাষে এই মাস থেকে রশ্মির পরিমাণ বেশী হওয়ার জন্য ফলন অনেক বেশী পাওয়া যায়। উত্তর ভারতে এপ্রিল-মে মাসে দিনের তাপমাত্রা অত্যন্ত (৪০°সে) বৃদ্ধি পায়। সেই কারণে এমন সময় ধান লাগান উচিত যাতে শীষ বেরোন বা দানা শক্ত হওয়ার সময় এই তাপমাত্রার প্রকোপ না পড়ে। মেঘলা দিন বা বেশী ছায়ায় পাশকাঠি বেরোনর সময় দীর্ঘ হয়, বেশী পাশকাঠি ছাড়তে পারে না। শীষ ছোট হয় ও প্রতি শীষে দানার সংখ্যা কমে যায়।

৭.৩ বেশী তাপমাত্রা ও বাতাসের তীব্র গতিতে ফসলের পাতা রোদে ঝলসে যায় ও স্ক্যাল্ড রোগ দেখা দেয়।

৭.৪ তাপমাত্রা যখন নীচে থাকে তখন বীজ অঙ্কুরিত হতে, চারার বৃদ্ধি, কাণ্ডের বৃদ্ধি এমন কি শীষ বেরোতে দেরী হয়। সেই কারণে শীতপ্রধান দেশে বীজ বপনের পরে জমিতে অধিক পরিমাণে জল রাখা হয়; যতদিন না চারা পুষ্ট ও সতেজ হয়। তাপমাত্রা যদি চারা লাগাবার সময় খুব নীচের দিকে (১৮°সে) থাকে তাহলে চারা মরে যায়। মাটির তাপমাত্রা ১৬°সে বেশী থাকলে শিকড় বেরোতে সাহায্য করে। তাপমাত্রা যখন খুব কম থাকে বা খুব ঠাণ্ডা পড়লে দানার পুষ্টিতে সাহায্য করে; কিন্তু ঐ রকম তাপমাত্রা যদি শীষ বেরোনর সময় থাকে তাহলে চিটে বা মরা শীষ বেশী হয়। মাঝারি ঠাণ্ডা যেমন দানা পুষ্টিতে সাহায্য করে তেমনি বেশী ঠাণ্ডা দানা পুষ্টও হতে দেয় না, এই কারণে দেশী ধান নভেম্বর মাসের পরে পাকে। তার দানা পুষ্ট হয় না।

৭.৫ গাছের পাতার ঠিক উপরের বায়ুস্তরে যদি আর্দ্রতা বেশী হয় তাহলে গাছের বৃদ্ধির সহায়ক হয়।

৭.৬ মাটির অভ্যন্তরের জলীয় অংশের অবস্থা ও জলের চাহিদা উচ্চফলনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। ১১২০—১৫০০ মিমি বৃষ্টিপাত একটি ফসলের (৪ মাসের) জন্য জরুরী; বিশেষ করে ৭-১০ সেমি জল মাঝে মাঝে যদি পাওয়া যায়। পাশকাঠি ছাড়ার পর থেকে দানা পাকা পর্যন্ত জমিতে জল থাকা অত্যন্ত আবশ্যক। শীষ তৈরীর সময় থেকে শীষ বেরোন পর্যন্ত জমিতে জলের অভাব হলে ফলনের ক্ষতি হয়।

৭.৭.১ স্যাঁতসেঁতে মাটিতে রোয়াকরা ধানের শিকড়ের বৃদ্ধি বেশী হয়; কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে বেশী পাশকাঠি ছাড়তে পারে না। শীষ বড় ও দানা পুষ্ট হয় না।

৭.৭.২ বিভিন্ন ধানের জাত, স্থানীয় আবহাওয়া, লাগাবার সময়, মাটি ও তার জল ধারণ করার ক্ষমতা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে ৮০·০ থেকে ১৮০·০ সেমি জলের প্রয়োজন হয়।

৭.৭.৩ রোয়া ধানের ক্ষেত্রে পাশকাঠি ছাড়ার পর থেকে জমিতে অবশ্যই জল দাঁড়িয়ে থাকা দরকার ; যাতে মাটির তাপমাত্রা বজায় থাকে। আগাছা কম হয়, গাছের খাদ্য সহজলভ্য হয় ও ধান পাকা পর্যন্ত জলের অভাব না হয়।

৭.৭.৪ বোনা ধানের জন্য সম্পূর্ণ পাশকাঠি ছাড়ার আগে পর্যন্ত জলের চাহিদা কম হয়। কিন্তু রোয়া ধানের জমি তৈরীর জন্য ও চারা লাগাবার পর তাড়াতাড়ি শিকড় জমতে সাহায্য করে।

৭.৭.৫ বোনা ধান, রোয়াকরা ধান থেকে পৃথক, কারণ রোয়া ধানের জন্য ধান কাটার ৭ দিন আগে পর্যন্ত জল লাগে কিন্তু বোনা ধানে লাগে না।

৭.৮ কেবলমাত্র ভাসমান জাতের ধান ছাড়া সব জাতের ধান খরা ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সামান্য কিছু জাতের ধানে খরা ও বন্যা সহনশীলতার লক্ষণ দেখা যায়। ধানজমির জলের তাপমাত্রা গাছের বৃদ্ধি বা ফলনের উপর বিরূপ প্রক্রিয়ার সৃষ্টি করে। পরিষ্কার জলের তাপমাত্রা বেশী ও সব জায়গায় সমান হয়। কিন্তু ঘোলা জলের দিনের তাপমাত্রা কম হয় ও রাত্রের তাপমাত্রা বেশী ও সমান হয়।

৭.৯ অল্প দিবাকালের সময় ফুল আগে আসে। নাবি জাতের ধান সাধারণতঃ আলোক সংবেদনশীল। এই কারণে ধান বোনা বা লাগানর সময়কাল গাছের বয়সের উপর (বীজ লাগান থেকে ধান কাটা পর্যন্ত) প্রতিফলিত হয়।

৭.১০ মাঝারি বাষ্পীভবন (না বেশী শীত বা বেশী গরম অবস্থা) ফলন বৃদ্ধির সহায়ক। এর কারণ এর দ্বারা গাছের মাঝারি বাষ্পীমোচন হয় এবং প্রয়োজনীয় খাদ্য গ্রহণের সহায়ক হয়। তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে পাতার তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং বাষ্পীমোচন গাছের তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে সমতায় আনতে পারে না ; ফলে খাদ্যগ্রহণের পরিমাণ কম হয়। আবার তাপমাত্রা খুব কম হলে বাষ্পীমোচন একই ভাবে পাতার তাপমাত্রাকে সঠিক স্তরে রাখতে পারে না, যার জন্য কম খাদ্য গ্রহণ হয়। উভয়

ক্ষেত্রেই শ্বাস প্রশ্বাস বেশী হয় এবং খাদ্য কম তৈরী হয় ; ফলে ফলন কম হয়।

ধান তার জীবনে তিনটি অবস্থায় জলের অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে ঃ—

১। চারা লাগাবার সময়।

২। পাশকাঠি ছাড়ার সময়।

৩। শীষ পাতা বেরোবার পর দানা তৈরী হওয়ার সময় পর্যন্ত। পরবর্তী পর্যায়েও জলের অভাবে দানা পুষ্ট হয় না।

৮। ধানজমির শ্রেণী বিভাগ ঃ

৮.১ ভূমির আকৃতি ও জলবিজ্ঞানের ভিত্তিতে চাষযোগ্য ধানজমিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়।

৮.১.১ সেচযুক্ত অথবা যেখানে চাষের জন্য শতকরা ১০০ ভাগ জল সরবরাহ করা যায়।

৮.১.২ অসেচ এলাকা বা বৃষ্টি নির্ভরশীল। অসেচ এলাকা তিন প্রকার ঃ

৮.১.২.১ প্লুভিয়াল বা সমতল আলবিহীন জমি, যেখানে জল ধরে রাখা যায় না। ভাল জল নিকাশী ব্যবস্থা আছে। মাটির নীচে যেখানে সাধারণতঃ শিকড় থাকে, সেখানে কোন অতিরিক্ত জল জমতে পারে না। একেই ডাঙ্গা জমি বলে। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গে এরকম জমিতে আল থাকে।

৮.১.২.২ ফেরাটিক বা ঢালু সমতল আলবিহীন জমি। কিন্তু মাটির নীচে যেখানে শিকড় থাকে সেখানে অতিরিক্ত জল ধানের জীবনকাল পর্যন্ত পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। এই ধরনের জমি জলের স্তরের উপস্থিতির উপর নির্ভর করে থাকে।

৮.১.২.৩ ফ্লুভিয়াল বা নীচু স্যাঁতসেঁতে জমি ঃ যেখানে জমি সমতল ও বর্ষাকালে জল জমে থাকে।

৮.২ ধান চাষ উপযোগী মাটি : ধান প্রায় সব প্রকার মাটিতে হতে পারে। অনুর্বর এবং ডাঙ্গা জমি যেখানে জল জমে না এমন জমি থেকে শুরু করে যেখানে অনেক জল (২০০—৩০০ সেমি) জমে বা লবণাক্ত ও ক্ষারযুক্ত জমিতেও ধান চাষ হয়।

৮.৩ ধান জমি ও জীবাণু : এক ধরনের জীবাণু ধান জমিতে জল থাকার জন্য সাহায্য করে। এই জীবাণুরা অক্সিজেন ছাড়া জীবন যাপন করতে পারে (এনারোবিক মাইক্রোবস্) বা বংশবৃদ্ধি করতে পারে এবং মাটির অভ্যন্তরের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সহায়ক হয়। তাছাড়াও মাটির উপরিভাগের পাতলা আস্তরণে (যা বায়ুর সংস্পর্শে আসে), (এরোবিক মাইক্রোবস্) আর এক প্রকারের জীবাণু থাকে, এরা বায়ুস্থিত অক্সিজেন ছাড়া জীবন ধারণ করতে পারে না। যেহেতু এই ধরনের জমিতে উপরোক্ত দুই প্রকারের জীবাণু অবস্থান করে, সেইজন্য অক্সিডেসন-রিডাকসন্ বিক্রিয়া মাটির অভ্যন্তরে সর্বদা হয়। মাটির ও জলের আনুপাতিক হারের সাথে এই দুই প্রকারের জীবাণু সংখ্যা বা প্রকারের প্রভেদ থাকে এবং এদের বিক্রিয়ার প্রভেদও পাওয়া যায়, এরা হল :

৮.৩.১ অবলিগেট এনারোব : যে জীবাণু অক্সিজেনে-এর সাহায্য ব্যতিরেকে নিজেদের বংশবৃদ্ধি করে থাকে।

৮.৩.২ ফেকালটেটিভ এনারোব : যে জীবাণু দুই ভাবেই বিশেষ অবস্থায় নিজেদের বংশবৃদ্ধি করে থাকে। বিভিন্ন পরীক্ষার দ্বারা জানা যায় যে, যেসব জমিতে জল বেশী পরিমাণ থাকে সেখানে ব্যাকটিরিয়া পাওয়া যায় ও ডাঙ্গা জমিতে ফানজই ও একটিনোমাইসিটিস্ বেশী পরিমাণে থাকে। মাটির নীচের (সাব সয়েল) ঠিক উপরের অংশে ও মাটির উপরের অংশে (টপ সয়েল) যাকে রাইজোসফিয়ার বলে, গাছের শিকড় বেশী থাকে। এই অংশে মাইক্রোব্যাকটেরিয়া, ব্যাসিলাস, সিউডোমোনাস ও অন্যান্য জৈবিক জীবাণু বেশী থাকে।

৮.৩.৩ এরোবিক মাইক্রোবস্ যেমন ফানজাই, নিমাটোড, ঈষ্ট, প্রেটোজোয়া অনেক সময় গাছের শিকড়ের ভেতরে পাওয়া যায়।

৮.৩.৪ জমিতে জল থাকলে প্রথমে এরোবিক ব্যাকটিরিয়া (বিশেষ করে জল জমিতে পড়লে বা জমলে প্রথম ২-৪ দিন) পরে ফেকালটেটিভ এনারোবস্ ও তার পরে শুধু এনারোবস্‌রা কার্যকর হয়। এইসব ব্যাকটিরিয়া মাটির ভেতরে জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ার দ্বারা দ্রবণীয় হয়, খনিজ পদার্থ প্রস্তুত করে। কখনও ইমমবিলাইজেসন বা অচল অবস্থা সৃষ্টি করে ও অক্সিডেসন বা অম্ল-জান মিশ্রণ, রিডাকসন বা লঘুকরণ ইত্যাদিতে সাহায্য করে। মাটির উর্বরতাকে স্থিতিশীল রাখার জন্য ও পর্যাপ্ত উৎপাদনে সাহায্য করার জন্য এদের ভূমিকা আছে। এরা খনিজ পদার্থ তৈরী ও কারবন, নাইট্রোজেন, ফরফরাস ও সালফার জাতীয় ধাতুর অচল অবস্থা সৃষ্টি করে। মুক্ত নাইট্রোজেনকে আবদ্ধ করা অথবা ফসফরাসকে দ্রবণীয় করার কাজে জীবাণুদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৮.৩.৫ জলা জমিতে বিভিন্ন প্রকারের নাইট্রোজেন সংগ্রহকারী জীবাণু পাওয়া যায়। তার মধ্যে এজ্যাটোব্যাক্টর প্রতিগ্রাম মাটিতে (০—$১০^{৪}$ ক্লসট্রিডিয়া প্রতিগ্রাম মাটিতে ১০—$১০^{৬}$) ও নীল সবুজ শ্যাওলা; (প্রতিগ্রাম মাটিতে $১০^{২}$—$১০^{৩}$) অন্যতম। এইসব জীবাণুদের সংখ্যা জমির অম্লত্ব বা ক্ষারত্ব, জৈব পদার্থ ও ফসফরাসের অবস্থার উপর নির্ভরশীল। ক্লসট্রিডিয়া বা এজোটোব্যাক্টর জলা জমিতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে না। নীল সবুজ শ্যাওলা জলা বা নীচু জমিতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

৮.৩.৬ সম্প্রতি একপ্রকার নাইট্রোজেন আবদ্ধকারী ব্যাকটিরিয়া প্রোপিওনি ব্যাকটিরিয়াম আবিষ্কৃত হয়েছে। (হাযাসি ও ফুরুসুফা, ১৯৭৯)। উহা ধানের শিকড়ের মধ্যে পাওয়া যায়। এরা সরাসরি মুক্ত নাইট্রোজেন সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা রাখে।

৮.৪.১ কৃষি জলবায়ুভিত্তিক (মূর্তি ১৯৭৮) বিভাগ অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের ধানজমি 'হিয়ুমিড্ বেঙ্গল আসাম বেসিন' বিভাগের অন্তর্গত। এই বিভাগের বৈশিষ্ট্য হল গড় বৃষ্টিপাত ২০০০ মিমি

জানুয়ারী মাসের তাপমাত্রা ১০—২৫° সেলসিয়াস ও জুলাই মাসের তাপমাত্রা ২৫—৪১° সেলসিয়াস। এই বিভাগে নিম্নলিখিত শ্রেণীর মাটি পাওয়া যায়।

১। গাঙ্গেয় পলিমাটি। ২। তরাই মাটি।
৩। লাল কাঁকুরে মাটি। ৪। লালচে হলুদ দো-আঁশ মাটি।
৫। লাল বেলে ও কাঁকুরে মাটি।

৮.৪.২ বসাক (১৯৭৬)-এর মতে পশ্চিমবঙ্গের মাটির শ্রেণী-বিন্যাস এইরূপ—

মাটির শ্রেণী	জমির মরিমাণ (হেক্টরে)
গাঙ্গেয় পলিমাটি	১,৫৯৭,১১০
বিন্ধ্যেয় পলিমাটি	১,২৯২,২১৭
তরাই ও তিস্তা পলিমাটি	৬৪৭,৭৭৭
সমুদ্রতট মাটি	১,১৪১,৭০২
কাঁকুরে মাটি	৫৮৮,৮২৩
লাল মাটি	৪৯৬,৩৪৬
পাথুরে মাটি	১,৩১৩,৬১৯
ধূসর বনাঞ্চল	১৯৪,৩৩৩

৮.৪.৩ বর্তমানে কৃষি জলবায়ু ভিত্তিক শ্রেণী বিন্যাসে পশ্চিমবঙ্গকে নিম্নলিখিত ৬টি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে ঃ

১। পাহাড়ী অঞ্চল
২। তরাই অঞ্চল
৩। গাঙ্গেয় নতুন পাললিক অঞ্চল
৪। গাঙ্গেয় পুরান পাললিক অঞ্চল
৫। রাঢ় অঞ্চল বা বিন্ধ্য অঞ্চল
৬। সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চল

মাটি পরীক্ষা ও সারের মান বিষয়ে পূর্বাঞ্চলীয় কর্মশালা ১৪-১৫ সেপ্টেম্বরে, ১৯৭৬-এ শ্রী এম. এন. বসাক প্রাক্তন কৃষি রসায়নবিদ কর্তৃক পঠিত পত্র হইতে সংগৃহীত।

৮.৪.৪ **গাঙ্গেয় পলিমাটি অঞ্চল :** পশ্চিমবঙ্গে ঢোকার আগে গঙ্গা নদী প্রায় ২৪০০ কিলোমিটার দীর্ঘ সমতল ভূমি পার হয়ে আসে। এই যাত্রাপথে সংগৃহীত মাটি থেকে এই অঞ্চল সমৃদ্ধ। হাওড়া, হুগলী, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, মালদা, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলা এই মাটির দ্বারা গঠিত। এই অঞ্চলের গড় বৃষ্টিপাত ১৫-২৪ মিমি। দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু জুন মাসের মাঝামাঝি থেকে শুরু হয়; শতকরা ৮০ ভাগ বৃষ্টি এই ৪½ মাসে (সেপ্টেম্বর মাসের শেষ পর্যন্ত) হয়। কখনও কখনও অতি মূল্যবান বৃষ্টি মার্চ-এপ্রিল মাসেও পাওয়া যায়। মাটির মান সাধারণতঃ নিরপেক্ষ। মাটির মধ্যে কাদার ভাগ বেশী ও খনিজ ভাগ প্রায় ইলাইট শ্রেণীর মত হয়। এই মাটির ক্যাট আয়ন বিনিময় ক্ষমতা প্রতি ১০০ গ্রাম মাটিতে প্রায় ২০-৪০ মিলি ইকুইভেলেণ্ট। এই মাটিতে অল্প থেকে মাঝারি রকমের জৈব অংশ থাকে আর অনুকূল পরিবেশে প্রায় সব প্রকারের ফসল উৎপন্ন হয়। এই অঞ্চল যদিও সমতল কিন্তু অনেক জায়গায় জল নিকাশের সুবন্দোবস্ত না থাকায় (বিভিন্ন কারণে) ধানের ফলন কমে যায়। ফুল আসার সময় ও পরে গাছ শুয়ে পড়ে তাই নাইট্রোজেনঘটিত সার প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না।

৮.৪.৫ **বিন্ধ্যেয় পলিমাটি অঞ্চল :** বিন্ধ্য পাহাড় থেকে উৎপত্তি এমন সব নদী যেমন দামোদর, কংসাবতী ও ময়ূরাক্ষী অববাহিকার আনা মাটি দিয়ে এই অঞ্চল সমৃদ্ধ। বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও বর্ধমান, হুগলী, মেদিনীপুরের কিছু অংশ ও মুর্শিদাবাদ জেলার কিছু অংশ নিয়ে এই অঞ্চল গঠিত। এই অঞ্চলের মাটি সামান্য অম্লত্ব থেকে নিরপেক্ষ (পি. এইচ. ৫.৫-৭.২); মাটিতে জৈব অংশ খুব কম। মাঝারি ও উচ্চ মাত্রায় ফসফরাস থাকে। এই ধরনের জমির জলনিকাশ ব্যবস্থা ভাল। সেচ ব্যবস্থা ভাল। ধান এই অঞ্চলের মূল ফসল ও ফলনের হার বেশী।

৮.৪.৬ **তরাই ও তিস্তা পলিমাটি অঞ্চল :** হিমালয় থেকে উদ্ভূত তিস্তা, তোরসা, মহানন্দা, জলঢাকা, কালজানি, সংকোষ ও অসংখ্য শাখা

নদী থেকে সংগৃহীত মাটিতে এই অঞ্চল সমৃদ্ধ। সম্পূর্ণ জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলা, দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমা ও পশ্চিম-দিনাজপুর জেলার মহকুমা নিয়ে এই অঞ্চল গঠিত। এখানকার মাটি হালকা; অগ্রহণযোগ্য জৈব অংশ বেশী ও জলনিকাশী ব্যবস্থা খুব ভাল। বৃষ্টিপাত ১৫২৫—৩৫০০ মিলিমিটার ও শতকরা ৭৫ ভাগ বৃষ্টি জুন মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত হয়। জমিতে অম্লের ভাগ বেশী (পি. এইচ ৫.২ থেকে ৬.২) এবং জৈব সার সাধারণতঃ অপরিপক্ব হয়। ধান, পাট ও ভুট্টা মূল ফসল। তাছাড়া চা, আনারস ইত্যাদি ফলও বেশী হয়। ধানের আনুপাতিক গড় ফলন কম। পাট খুব ভাল হয়। তামাক চাষ কুচবিহার জেলার একটি অর্থকরী ফসল। চুন বা ঐ জাতীয় পদার্থ প্রয়োগ করলে মাটির অম্লত্ব দূর হয়। চুনের পরিপূরক ডলোমাইট জলপাইগুড়ি জেলার জয়ন্তী পাহাড়ে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া হায়। অম্লত্ব দূর করলে ফলন বৃদ্ধি হয়; বেশী মাত্রায় অম্ল মাটির জন্য ডাল জাতীয় শস্য হয় কিন্তু ফলন ভাল হয় না। ফসফেট জাতীয় সার মাটিতে আবদ্ধ হয়ে থাকে।

৮.৪.৭ **সমুদ্রতট অঞ্চল ঃ** এই অঞ্চল কেবলমাত্র হাওড়া ও মেদিনীপুরের কিয়দংশ ও সম্পূর্ণ দক্ষিণ ২৪-পরগণার মধ্যে সীমাবদ্ধ। গঙ্গার অসংখ্য শাখা উপনদী মোহনায় এসে পড়ায় অসংখ্য ব-দ্বীপের সৃষ্টি হয়েছে। সাধারণতঃ এই অঞ্চলের মাটি সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামে সমৃদ্ধ। এই অঞ্চলের মাটি বিভিন্ন প্রকারের ঃ

৮.৪.৭.১ **লবণাক্ত অঞ্চল ঃ** সাধারণতঃ নিরপেক্ষ থেকে সামান্য ক্ষারযুক্ত হয়। মাটিতে ০·১৫ শতাংশের কম লবণ ও ১৫ শতাংশের কম পরিবর্তনযোগ্য সোডিয়াম এই মাটিতে পাওয়া যায়। ধান চাষ এখানে করা যায়।

৮.৪.৭.২ **ক্ষার ও লবণাক্ত অঞ্চল ঃ** এই অঞ্চলের মাটিতে লবণের ভাগ ০·১৫ শতাংশের বেশী ও পরিবর্তনযোগ্য সোডিয়ামের

ভাগ ১৫ শতাংশের বেশী। পি. এইচ. সাধারণতঃ ৭.৫ বেশী ও মাটি ও জল একসাথে মিশে থাকে।

৮.৪.৭.৩ **অলবণাক্ত ক্ষার মাটি**ঃ এই মাটিতে শতকরা ০.১৫ ভাগের কম লবণ পাওয়া যায় কিন্তু পরিবর্তনযোগ্য সোডিয়াম ১৫ শতাংশর বেশী পাওয়া যায়। মাটির বা ক্ষার প্রতিক্রিয়া হয়।

৮.৪.৭.৪ **নিম্নস্তরের ক্ষারযুক্ত মাটি**ঃ এই ধরনের মাটিতে পরিবর্তনযোগ্য সোডিয়ামের ভাগ ১৫ শতাংশের বেশী হয়। কিন্তু মাটিতে অম্লের প্রতিক্রিয়া হয়। মাটিতে চুন বা ঐ জাতীয় পদার্থের ভাগ খুব কম হয়। সমুদ্রতট অঞ্চলে বেশীর ভাগ লবণাক্ত মাটি পাওয়া যায়। তাছাড়া অন্যান্য প্রকারের মাটি কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে পাওয়া যায়। এইসব মাটিতে সোডিয়াম ও ক্যালসিয়াম সমভাগে (প্রতি ১০০ গ্রাম মাটিতে ৪ মিলি ইকুইভেলেণ্ট) পাওয়া যায়। কিন্তু ম্যাগ্নেসিয়াম প্রায় দ্বিগুণ পাওয়া যায়। ম্যাগনেসিয়ামের আধিক্য দেখা যায় বলে শুকনো অবস্থায় মাটি কঠিন শক্ত চাপযুক্ত হয়। কিন্তু ভিজে গেলে ভীষণ কাদা কাদা হয় ও জলনিকাশী ব্যবস্থা বন্ধ হয়। যেহেতু এই ধরনের জমির মাটি কর্ষণ পরিচালনায় অসুবিধা হয় সেহেতু এই অঞ্চলে একটি ফসল ধান বর্ষাকালে চাষ করা সম্ভব হয়। অন্য সময় ফসল করা সম্ভব হয় না। জিপসাম বৃষ্টির আগে জমিতে প্রয়োগ করলে ধানের ফলন ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এই অঞ্চল নীচুতে অবস্থিত বলে বর্ষাকালে বেশী বৃষ্টি হলে জলনিকাশ করা সম্ভব হয় না। কেবল দেশী লম্বা জাতের অধিক বৃষ্টি সহনশীল জাতের ধান করা যায়। কিন্তু এই জাত সাধারণতঃ মোটা দানার এবং ফলন কম হয়। উচ্চফলনশীল বেঁটে জাতের ধান লাগান যায় না। যেসব অঞ্চলে একটু উঁচু জমি আছে সেখানে গবেষণার ফলাফল অনুযায়ী ধানের পরে সঞ্চিত জলের সাহায্যে তিল লাগিয়ে সুফল পাওয়া গেছে। কিছু কিছু অঞ্চলে মে মাসে উচ্চফলনশীল ধান (১০০ দিনের) লাগিয়ে

আবার আগস্ট মাসে দেশী ধান লাগিয়ে দো-ফসলী জমিতে পরিণত করা সম্ভব হয়েছে।

৮.৪.৮ **কাঁকুড়ে মাটি অঞ্চল ঃ** এই ধরনের মাটি বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলায় পাওয়া যায়। সাধারণতঃ এই মাটি অসমতল হয় ও ধাপে ধাপে চাষ করা হয়। জমিতে অম্লত্ব বেশী থাকে ও কেওলিনাইট জাতীয় খনিজ দ্বারা পুষ্ট হয়। এই মাটির জলধারণের ক্ষমতা কম। গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১২৭০—১৫২৪ মিমি। জুন মাস থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত শতকরা ৮০ ভাগ বৃষ্টি হয়। ধান এখানকার উপযুক্ত ফসল। যেহেতু জমিতে অম্লত্ব বেশী সেজন্য চুন জাতীয় পদার্থ প্রয়োগ করলে ফলন বৃদ্ধি হয়। এই ধরনের জমিতে জলধারণ ক্ষমতা কম ও প্রচুর পরিমাণে জৈবসার প্রয়োগ করতে হয়। এতে জলধারণ ক্ষমতা বাড়ে ও রাসায়নিক বিক্রিয়ায় সাহায্য করে।

৮.৪.৯ **লাল মাটি অঞ্চল ঃ** বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, মালদা ও পশ্চিম-দিনাজপুর জেলায় বেশ কিছু এলাকায় এই লাল মাটি পাওয়া যায়। মাটি লাল বা ধূসর রংয়ের হয়। জমিতে সামান্য অম্লত্ব (পি. এইচ. ৫·৪—৬·৬) পাওয়া যায়। জমিতে জৈব পদার্থ ও দ্রবণীয় গ্রহণযোগ্য ফসফেট খুব অলপ।

৮.৪.১০ **পাথুরে মাটি অঞ্চল ঃ** ছোট নাগপুর উপত্যকার বি তৃত ভাগ থেকে তৈরী। এই প্রকারের মাটি পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বর্ধমান (আসানসোল) ও মেদিনীপুর জেলার পশ্চিম ভাগে পাওয়া যায়। মাটি অপেক্ষাকৃত অনুর্বর এবং সামান্য অম্ল থেকে নিরপেক্ষ (পি. এইচ. ৬·৫—৭·২)। ভূমি-সংরক্ষণ এখানকার একটি বড় সমস্যা।

৮.৪.১১ **ধূসর বনাঞ্চল ঃ** এই মাটি শিলিগুড়ি মহকুমা বাদে সমগ্র দার্জিলিং জেলায় পাওয়া যায়। এখানকার গড় বৃষ্টিপাত ৩৫৫·৬ মিমি ও সমুদ্রতট থেকে ১৫০-৬০০ মিটার উর্ধ্বে অবস্থিত। জমি সাধারণতঃ উর্বর। কিন্তু অত্যন্ত ঠাণ্ডা ও বেশী অম্লত্বের জন্য ফলন কম হয়। ৩৭৫ মি উচ্চতায় অবস্থিত জমিতে ধান চাষ হয়। তবে

বেশীর ভাগ এলাকায় ভুট্টা, আলু ও ফলের চাষ হয়। কমলালেবু ও নাসপাতি ফলের চাষ ব্যাপক হয়। অর্থকরী ফসল হিসাবে চা, এলাচ ও আদা প্রচুর পরিমাণে হয়।

৯। অনুমোদিত জাত ঃ

৯.১ চুঁচুড়া ও বাঁকুড়া ধান্য গবেষণা কেন্দ্র থেকে উদ্ভূত এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বারা অনুমোদিত কিছু ধানের কথা এখানে জানান হল ঃ

৯.১.১ **চিনসুরা-৪ (দুলার)** ঃ ইহা একটি সংকর ধান (দুমাই × লারকচ) ইহা ১৯৪৮ সালে অনুমোদিত হয়। কাঁকুরে ও পলিমাটি এলাকার ডাঙ্গা জমির জন্য উপযুক্ত এবং বোনা বা রোয়া করা যায়। মে মাসে লাগিয়ে বোনা ধান হিসাবে এবং জুন মাসে রোয়া ধান হিসাবে চাষ করা যায়। সেপ্টেম্বর মাসে ইহা কাটা চলে। সাধারণতঃ বোনা ধান ৯০ দিনে ও রোয়া ধান ১১০ দিনে কাটা যায় ও ১৭-১৮ কুইণ্টাল প্রতি হেক্টরে ফলন পাওয়া যায়। উৎপাদন ক্ষমতা ২৮ কুইণ্টাল প্রতি হেক্টরে। দানা মাঝারি লম্বা ও মোটা ১০০০টি দানার ওজন ২০ গ্রাম। মাজরা পোকার আক্রমণ ও মরচে পড়া রোগের সহনশীলতা আছে। দুলার ধান খরা সহনশীলও বটে। ইহা হুগলী, বর্ধমান, বীরভূম, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার জন্য অনুমোদিত।

৯.১.২ **চিনসুরা-১৬ (এন. সি. ১৬২৬)** ঃ বর্ধমান জেলার স্থানীয় জাত থেকে নির্বাচিত ও ১৯৬০ সাল থেকে লাগাবার জন্য অনুমোদিত। ইহা পলিমাটি অঞ্চলের বোনা বা রোয়া করার উপযুক্ত। দুলার ধানের মতই ধান লাগাবার সময় ; এবং ধান পাকতে সময় একই রকম নেয়। ২৪-২৫ কুইণ্টাল ফলন দেয় ও উৎপাদন ক্ষমতা ৩৪-৩৫ কুইণ্টাল। দানা মাঝারি ১০০০টি দানার ওজন ২১ গ্রাম। সার প্রয়োগে ফলন বাড়ে। আগাম পাকে ও চাল সাদা হয়। নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, হাওড়া, হুগলী ও বর্ধমানের জন্য বিশেষ করে অনুমোদিত।

৯.১.৩ **চিনসুরা-১৮ (এন. সি. ৯১৮)** ঃ বাঁকুড়া অঞ্চলের স্থানীয় আউশ ধান থেকে নির্বাচিত। এই ধান ১৯৬০ সালে চাষীদের

ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত হয়। পলিমাটি অঞ্চলের জন্য বোনা অথবা রোয়া করে লাগাবার জন্য অনুমোদিত। মে-জুন মাসে বোনা ও রোয়া করার যোগ্য এবং অক্টোবর মাসে কাটবার উপযুক্ত হয়। ইহা ১৩০-১৩৫ দিনে কাটার উপযুক্ত হয় এবং বোনা ধান ১০ দিন আগে কাটা চলে। ফলন ২৬-২৭ কুইণ্টাল। তবে ৩৮ কুইণ্টাল পর্যন্ত ফলন দিতে পারে। মাঝারি মোটা ধান ১০০০টি দানার ওজন ২৬ গ্রাম, চাল সাদা। এন. সি. ১৬২৬-র মতই উপরোক্ত জেলাগুলিতে চাষ করার উপযুক্ত।

৯.১.৪ বাঁকুড়া-১ (বাদকলমকাঠি-৬৫): আগাম আমন বা নবান্ন ধান হিসাবে ব্যবহারযোগ্য। নিম্নমানের জমি বা কাঁকুরে মাটির জন্য ১৯৪৮ সালে অনুমোদন পায়। সাধারণতঃ জুন মাসে বীজ ফেলে জুলাই মাসে রোয়া করা হয়। সেপ্টেম্বর মাসে ফুল আসে ও অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে কাটা যায়। এই ধান ১১০-১১৫ দিনে পাকে; ২৫-২৬ কুইণ্টাল ফলন হয় ও ৩০ কুইণ্টাল পর্যন্ত ফলন পাওয়া গেছে। দানা মাঝারি ও ১০০০টি দানার ওজন ২১·০ গ্রাম, চাল সাদা হয়। বোরোধান হিসাবেও এই ধানের চাষ চলে। সারা পশ্চিমবঙ্গে ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত।

৯.১.৫ বাঁকুড়া-৩৭ (চূর্ণকাঠি): লাল কাঁকুরে মাটি এলাকার স্থানীয় জাতের একটি বাছাই করা ধান। বাদ কলম কাঠি ৬৫র মত। এর লাগাবার সময় একপ্রকার; কিন্তু বয়স মাত্র ৫ দিন বেশী। ফলন ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত বেশী; ২৭-২৮ কুইণ্টাল ফলন হয়; তবে ৩৮ কুইণ্টাল পর্যন্ত ফলন পাওয়া গেছে। এক হাজার দানার ওজন ১৯ গ্রাম, দানা মাঝারি সরু ও চাল সাদা; তবে সামান্য লালচে ভাব আছে। বিভিন্ন অবস্থায় নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে। সার গ্রহণ করার ক্ষমতা বেশী। আগাম জাতের ধানের মধ্যে সবথেকে বেশী ফলন দেয়। পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র লাগাবার জন্য অনুমোদিত।

৯.১.৬ চিনসুরা-১৩ (রূপসাল): হাওড়া ও ২৪-পরগণা অঞ্চল থেকে স্থানীয় ধানের একটি নির্বাচিত জাত ও ১৯৪৮ সাল থেকে

কৃষকদের ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত হয়। সাধারণতঃ লাল কাঁকুরে মাটি এলাকায় রোয়া ধান হিসাবে ব্যবহারযোগ্য। জুন মাসে বীজতলা তৈরী করে জুলাই মাসে রোয়া করতে হয়। পাকতে ১৩০ দিন সময় নেয়। সাধারণভাবে গড়ে ২৪ কুইণ্টাল ফলন দেয়; তবে ৩০-৩২ কুইণ্টাল পর্যন্ত ফলন দেবার ক্ষমতা আছে। মরচে পড়া রোগ সহনশীল। ধান মাঝারি সরু ও ১০০০ টি দানার ওজন ১৭ গ্রাম। সর্বত্র লাগান যায়; এমনকি লবণাক্ত এলাকাতেও লাগাবার উপযুক্ত। ২৪-পরগণা, হাওড়া, হুগলী, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার জন্য অনুমোদিত।

৯.১.৭ চিনসুরা-২৭ (ঝিঙাশাল): হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন স্থানীয় জাত থেকে নির্বাচিত এই জাত ১৯৪৮ সালে চাষীদের লাগাবার জন্য অনুমোদিত হয়। পলিমাটি অঞ্চল ও লাল কাঁকুরে মাটির উপযোগী ধান। ইহা ১৩০-১৩৫ দিনের ধান ও জুলাই মাসে লাগিয়ে নভেম্বরের শেষে কাটার উপযোগী হয়। ফলন রূপশালের মত। এই জাত মরচে পড়া রোগের দ্বারা সহজেই আক্রান্ত হয়। ধান মোটা ও লম্বা; ১০০০টি দানার ওজন ২৫ গ্রাম। চাল সাদা, লম্বা মোটা ও চালের মাজায় সাদা দাগ দেখা দেয়। চিড়া, মুড়ি ও খইয়ের জন্য এই জাতের সুনাম আছে। হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান ও বাঁকুড়ার জন্য অনুমোদিত।

৯.১.৮ চিনসুরা-৫ (নাগরা ৪১/১৪): হুগলী ও বর্ধমান জেলার স্থানীয় নাগরা ধান থেকে নির্বাচিত এবং সরকার ১৯৪৮ সালে সাধারণের ব্যবহারের জন্য অনুমোদন করেন। রোয়া ধান হিসাবে ব্যবহার করা যায়। জুন মাসে বীজতলা তৈরী করতে হয় এবং জুলাই মাসে রোয়া করা যায়। এই ধান ১২৫-১৩০ দিনের মধ্যে কাটার উপযুক্ত হয়। নভেম্বরের শেষ থেকে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে কাটা যায়। গড় ফলন ২৭-২৮ কুইণ্টাল; ৩৭ কুইণ্টাল পর্যন্ত ফলন দেবার ক্ষমতা থাকে। মরচে রোগ সহনশীল, মাঝারী দানা ও ১০০০টি দানার ওজন

২০ গ্রাম। চাল ধবধবে সাদা। ভাত সুস্বাদু হয়। হুগলী ও বর্ধমানের জন্য অনুমোদিত।

৯.১.৯ **চিনসুরা-৩ (ভাসামানিক)**ঃ নাগরা ৪১/১৪-র সমগোত্রীয় এই ধান হুগলী জেলার নাগরা জাতীয় স্থানীয় ধান থেকে নির্বাচিত। পলিমাটি ও কাঁকুরে লাল মাটির এলাকার জন্য উপযুক্ত। নাগরা ৪১/১৪-র মতন চাষ করতে হয়। ফলন ৪০ কুইণ্টাল পর্যন্ত হয় এবং দানার ওজন ১৯.৪ গ্রাম। মাঝারী সরু দানার চাল এবং ভাত খেতে ভাল। মুড়ি ভাল হয়। হুগলী ও বর্ধমান জেলার জন্য অনুমোদিত।

৯.১.১০ **চিনসুরা-২৩ (দুধসর)**ঃ উত্তরবঙ্গের উপযুক্ত। স্বাধীনতা পূর্বাকালে অবিভক্ত উত্তরবঙ্গ থেকে সংগৃহীত হয়। ধান লাগান ও কাটা প্রায় ভাসামানিকের মতন; তবে ২—৪ দিন আগে পাকে। গড় ফলন ২৭ কুইণ্টাল; সর্বোচ্চ ফলন ৩৭ কুইণ্টাল পর্যন্ত হয়। মরচে রোগ সহণশীল জাত। দানা মাঝারি ও ১০০০ টি দানার ওজন ২১ গ্রাম। ইন্দ্রসাল (চিনসুরা-২৯) ও দুধসর প্রায় একই রকম। শুধু দুধসর ৪-৬ দিন আগে পাকে। চাল সাদা। উত্তরবঙ্গের জন্য ১৯৪৮ সালে অনুমোদিত হয়।

৯.১.১১ **চিনসুরা-২৫ (লাঠিসাল)**ঃ পূর্ববঙ্গ থেকে বাছাই করা ধান ১৯৪৮ সালে চাষীদের লাগাবার জন্য সরকার অনুমোদন করেন। অন্যান্য মাঝারি ধান, যেমন নাগরা ভাসামানিক ধানের মতন লাগান যায়। বীজ থেকে বীজ হতে ১২৮ দিন লাগে ও ফলন ২৭-২৮ কুইণ্টাল হয়। সর্বোচ্চ ফলন ৩৬ কুইণ্টাল পর্যন্ত হয়। মরচে রোগ সহনশীল নয়। দানা মাঝারি ও মোটা হয়। ১০০০ টি দানার ওজন ২৬ গ্রাম। চাল মাঝারি, মোটা, সাদা হয়। সামান্য খরা সহনশীল, দানা শীষ থেকে সহজে ছাড়ান যায় না। রোয়া ধান হিসাবে লাগান যায়। ভাসামানিক থেকে আগে পাকে।

৯.১.১২ **চিনসুরা-১১ (কলমা-২২২)**ঃ স্থানীয় কলমা থেকে নির্বাচিত এই ধান ১৯৪৮ সালে চাষীদের জন্য অনুমোদিত হয়। মধ্যম

পলিমাটি অঞ্চলের জন্য ভাল। অন্যান্য মাঝারি ধানের মতন জুন মাসে বীজতলায় ফেলে জুলাই মাসে রোয়ার পর ডিসেম্বর প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত কাটা যায়। বীজ থেকে বীজ হতে সময় নেয় ১৩০ দিন। মরচে পড়া রোগে সহজে আক্রান্ত হয়। গড় উৎপাদন ২৭-২৮ কুইণ্টল পর্যন্ত ও ফলন ৩৮ কুইন্টাল পর্যন্ত পাওয়া গেছে। দানা লম্বা ও মজবুত ও ১০০০টি দানার ওজন ২৮ গ্রাম। চাল সাদা, লম্বা ও সুস্বাদু হয়। বর্ধমান, হাওড়া ও হুগলী জেলার জন্য অনুমোদিত।

৯.১.১৩ চিনসুরা-৭ (পাটনাই-২৩): সুন্দরবন অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করা স্থানীয় জাত থেকে প্রস্তুত এই জাত ২৪-পরগণার জন্য অনুমোদিত। লাগানর সময় অন্যান্য মাঝারি জাতের ধানের মত ১২৫-১৩০ দিনে পাকা ধান কাটার উপযুক্ত হয়। গড় ফলন ৩০-৩২ কুইণ্টাল। সর্বোচ্চ ফলন ৪৪-৪৫ কুইণ্টাল গোসাবা অঞ্চলে পাওয়া গেছে। মরচে রোগে এই ধান গোসাবা অঞ্চলে সহজে আক্রান্ত হয়। কিন্তু বর্ধমান ও হুগলী জেলায় এই জাত রোগ সহনশীল। দানা বড় ও লম্বা; ১০০০টি দানার ওজন ৩২ গ্রাম। চাল সাদা ও বড় হয়। খই খুব ভাল হয়।

৯.১.১৪ চিনসুরা-২১ (আচরা-১০৮/১): আসাম থেকে সংগ্রহ করা স্থানীয় ধান থেকে নির্বাচন করা হয়। সাধারণের মধ্যে ১৯৪৮ সালে বিতরণ করার জন্য অনুমোদিত হয়। পলিমাটি ও লাল কাঁকুড়ে অঞ্চলের নীচু জমিতে ব্যবহার করার উপযুক্ত। এই ধান বোনা ও রোয়া করে চাষ করা যায়। বোনার সময় মে মাস ও রোপণ করার জন্য জুন মাসে বীজ-তলা তৈরী করতে হয়। এই ধান ১৬০-১৬৫ দিনে কাটার উপযুক্ত হয় এবং জানুয়ারী মাসে প্রথম সপ্তাহে কাটা হয়। গড় ফলন ২০-২৫ কুইণ্টাল, ৩২ কুইণ্টাল পর্যন্ত ফলন পাওয়া গেছে। এই জাত মরচে পড়া রোগ প্রতিরোধ করতে পারে না। ধানের দানা লম্বা, মোটা ও ১০০০টি দানার ওজন ২৫ গ্রাম। নীচু জমি যেখানে ১৫০ সেমি পর্যন্ত জল দাঁড়িয়ে থাকে, এইরকম জমিতে এই ধানের চাষ চলে এবং গাছ কখনও পড়ে যায় না।

৯.১.১৫ **চিনসুরা-১৯ (কুমারগোর)** : এই ধান সুন্দরবন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত। নীচু জমি ও লবণাক্ত জমির উপযুক্ত। এই ধান বোনা ও রোয়া করা যায়। বোনা অথবা রোয়ার সময় চিনসুরা ২১-এর মত। এই ধান চিনসুরা ২১-এর তুলনায় ৫ দিন আগে পাকে ও প্রায় ২ কুইণ্টাল বেশী ফলন দেয়। লম্বা ও মোটা দানার ধান এবং ১০০০টি দানার ওজন ২৬ গ্রাম। ধান থেকে শতকরা ৮০ ভাগ চাল পাওয়া যায়।

৯.১.১৬ **চিনসুরা-৩১ (তিলক কাছারি)** : পূর্ববঙ্গ থেকে সংগ্রহ করা ধান থেকে নির্বাচিত এবং ১৯৪৮ সালে সাধারণের ব্যবহারের জন্য সরকারী অনুমোদন পায়। পলিমাটি ও কাঁকুড়ে মাটিতে এই ধান হতে পারে। ইহা বোনা ও রোয়া হিসাবে লাগান যায়। মে মাসে বোনা হয় এবং জুন মাসে বীজতলায় বীজ ফেলা হয়। ১৫৫-১৬০ দিনে পাকে ও ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে কাটার উপযুক্ত হয়। গড় ফলন ২৪-২৫ কুইণ্টাল ও সর্বোচ্চ ফলন ৩৩ কুইণ্টাল পাওয়া গেছে। মোটা ধান ও ১০০০টি দানার ওজন ২০.০ গ্রাম। এই ধান ৯০-১০০ সেমি জল চাপ সহ্য করতে পারে।

৯.১.১৭ **চিনসুরা-৩৯ (কাটারিভোগ)** : উত্তরবঙ্গ থেকে এই স্থানীয় ধান সংগ্রহ করা হয়েছে। ১৯৫৩ সালে সরকার এই সুগন্ধী ধানচাষের জন্য অনুমোদন করেন। পলিমাটি অঞ্চলের জন্য উপযুক্ত এই ধান জুন মাসে বীজতলায় ফেলে জুলাই মাসে রোয়া করতে হয়। এই ধান পাকতে ১২৫-১৩০ দিন সময় নেয়। গড় ফলন ২৩-২৪ কুইণ্টাল ও সর্বোচ্চ ফলন ২৬ কুইণ্টাল পাওয়া গেছে। মরচে পড়া রোগ সহনশীল। ছোট ও সরু জাতের ধান, ১০০০ টি দানার ওজন ১৫.০ গ্রাম। সকল জেলার জন্য অনুমোদিত।

৯.১.১৮ **চিনসুরা-১৭ (বাদশাভোগ)** : স্থানীয় ধান থেকে নির্বাচিত এই ধান ১৯৪৮ সালে সরকারী অনুমোদন লাভ করে। অন্যান্য বিষয় চিনসুরা ৩৯-র অনুরূপ। কেবল দানা ছোট হবার জন্য ফলন কম হয়। গড় ফলন ২০-২১ কুইণ্টাল ও ১০০০ টি দানার ওজন

১১·২ গ্রাম। মাজরা পোকা ও মরচে রোগ সহনশীল। সুগন্ধী চাল পায়স, পোলাও ইত্যাদির জন্য ব্যবহার হয়।

৯.১.১৯ **বাঁকুড়া-৩৫ (রাধুনীপাগল)**ঃ এই জাত ১৯৫৩ সালে সরকারী অনুমোদন লাভ করে এবং অন্যান্য চরিত্র চিনসুরা-৩৯-এর অনুরূপ। ফলন ২৫-২৬ কুইণ্টাল ও ১০০০টি দানার ওজন ১৩·০ গ্রাম। গাছের গোড়ায় ও ধানের গায়ে কালো দাগ আছে। সাধারণতঃ কাঁকুরে মাটিতে ভাল হয়।

৯.১.২০ **চিনসুরা-৪৭ (এন. সি. ৬৭৮)**ঃ মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে সংগৃহীত এই ধান ১৯৬০ সালে সরকারী অনুমোদন লাভ করে। মাঝারি নিচু জমির জন্য উপযুক্ত। ১৪০-১৪৫ দিনে পাকে এবং ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে কাটার উপযুক্ত হয়। ফলন ৩৪-৩৫ কুইণ্টাল ও ৪৫-৪৬ কুইণ্টাল পর্যন্ত ফলন দেবার ক্ষমতা আছে। ধান মাঝারি মোটা ও ১০০০টি দানার ওজন ২৯·০ গ্রাম। চাল মোটা মাজার কাছে সাদা দাগ আছে। দক্ষিণবঙ্গের জন্য অনুমোদিত।

৯.১.২১ **চিনসুরা-৪৯ (এন. সি. ১২৮১)**ঃ এই ধান ২৪-পরগণা থেকে সংগৃহীত ও ১৯৬০ সালে ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত। বেঁটে মোটা এই ধান চিনসুরা-৪৭-এর অনুরূপ। ১০০০টি দানার ওজন ২৩.৫ গ্রাম। ফলন ৩৭-৩৮ কুইণ্টাল।

৯.১.২২ **চিনসুরা ৫১ (ও. সি. ১৩৯৩)**ঃ ২৪-পরগণা থেকে সংগৃহীত ও ১৯৬০ সালে ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত। নীচু জমিতে রোয়া ধান হিসাবে ভাল। ডিসেম্বরে কাটা যায় ও ১৪৫-১৫০ দিনের মধ্যে কাটার উপযুক্ত হয়। ফলন ৩৪—৩৫ কুইণ্টাল। মরচে রোগ সহনশীল। মোটা ধান ও ১০০০টি দানার ওজন ২৯·০ গ্রাম। খড় খুব ভাল হয়। পলিমাটি অঞ্চলের জন্য উপযুক্ত।

৯.১.২৩ **চিনসুরা ৪১ (এফ. আর ১৩এ)**ঃ উড়িষ্যার বন্যাপ্রবণ এলাকা থেকে সংগ্রহ করা এই ধান প্রচুর পরীক্ষার পর ১৯৫৩ সালে এই রাজ্যের জন্য অনুমোদন লাভ করে। বোনা ও রোয়া, দুই

ভাবেই চাষ করা যায়। ১৪০-১৪৫ দিনে কাটার উপযুক্ত হয়। এই ধান মে মাসের শেষে বুনতে হয়। রোয়া ধানের জন্য জুনমাসে বীজতলা তৈরী করতে হয়। ২৩-২৪ কুইণ্টাল গড় ফলন, দানা মোটা হয় ও ১০০০টি দানার ওজন ২৫ গ্রাম।

৯.১.২৪ **চিনসুরা-৪৩ (এফ. আর. ৪৩বি)ঃ** এই জাতটিও উড়িষ্যা থেকে আনা; ১৯৫৩ সালে পরীক্ষার পর ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত হয়। নীচু জমির জন্য উপযুক্ত। অন্যান্য চরিত্র চিনসুরা ৪১-র অনুরূপ। দানা চিনসুরা-৪১ থেকে সরু ও ১০০০টি দানার ওজন ২০ গ্রাম। চাল মোটা ও লাল, ১০০ সেমি পর্যন্ত জলের চাপ সহ্য করতে পারে। ৭ দিন জলে ডুবে থাকলেও ফলনের ক্ষতি হয় না।

৯.১.২৫ **চিনসুরা-৪৫ (এস. আর. ২৬ বি ঃ** লবণাক্ত জমির উপযুক্ত এই ধান উড়িষ্যা থেকে সংগৃহীত ও ১৯৫৩ সালে অনুমোদিত, অন্যান্য চরিত্র চিনসুরা ৪৩-র অনুরূপ। তবে ১০০০টি দানার ওজন ২৬.৩ গ্রাম। চাল ধূসর সাদা, উপকূলবর্তী অঞ্চলে ব্যবহারযোগ্য।

৯.১.২৬ **চিনসুরা বোরো-১ (সি. বি-১)ঃ** হুগলী জেলা থেকে নির্বাচিত এই ধান ১৯৫৬ সালে সরকারী অনুমোদন পায়। নভেম্বর মাসে বীজতলায় লাগিয়ে ডিসেম্বর মাসে রোয়া করা হয়। মে মাসের প্রথম সপ্তাহে কাটা যায়। ১৪০-১৪৫ দিনে ধান পেকে যায়। এই ধান ৫২ কুইণ্টাল পর্যন্ত ফলন দেবার ক্ষমতা রাখে। মরচে পড়া রোগ সহনশীল, দানা মোটা হয়। ১০০০টি দানার ওজন ২১ গ্রাম, চাল লাল রঙের হয়।

৯.১.২৭ **চিনসুরা বোরো-২ (সি. বি-২)ঃ** মেদিনীপুর জেলা থেকে সংগৃহীত এই জাত চিনসুরা বোরো-১ এর মতন। একই সময় লাগান হয়। ফলন ৪৫ কুইণ্টাল দেবার ক্ষমতা আছে, মোটা ধান, ১০০০টির ওজন ২৫ গ্রাম। চাল লাল ও মাঝারি দানা। সারা পশ্চিমবঙ্গে যেখানে বোরো ধান চাষ হয় সেখানে এই জাতের চাষ সম্ভব।

৯.১.২৮ **এম. পি. আর. এস-১ (সি. এন. এ. বি-৪) :** এই জাতটি চীনদেশ থেকে আমদানী করা। এই ধানটি পশ্চিমবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চলের জন্য অনুমোদিত। ১৯৬৫ সালে চাষীদের মধ্যে বিতরণের জন্য ছাড়া হয়। ৬৫০—১২০০ মিটার পর্যন্ত উঁচু পার্বত্য এলাকায় এই ধানের চাষ হয়। ফলন ভাল। জুন মাসের প্রথমপক্ষে বীজ ফেলে ৩০ দিনের চারা জুলাই মাসের প্রথম পক্ষে রোয়া করে নভেম্বর মাসের প্রথমপক্ষে কাটার উপযুক্ত হয়। ১৪০-১৫৫ দিনের মধ্যে কাটা যায়। গড় ফলন ২৩ কুইণ্টাল এবং ২৭-২৮ কুইণ্টাল পর্যন্ত ফলন দেবার ক্ষমতা আছে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম।

৯.১.২৯ **এম. পি. আর. এস.-২ (রামতুলসী)** পার্বত্য জেলা দার্জিলিং থেকে স্থানীয় ধান হিসাবে নির্বাচিত। এই ধান ১৯৬৫ সালে ৬৫০-১২০০ মিটার উচ্চতার ধান জমির জন্য অনুমোদিত হয়। জুন মাসে বীজ ফেলে জুলাই মাসে রোয়া করতে হয়। রোয়া করার ১৩০-১৩৫ দিনের পরে কাটার উপযুক্ত হয়। ফলন ১৭-১৮ কুইণ্টাল সাধারণতঃ হয় ; তবে ২২ কুইণ্টাল পর্যন্ত ফলন দেবার ক্ষমতা আছে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম। দানা মাঝারি ও ১০০০টি দানার ওজন ১৯.৫ গ্রাম। সামান্য সুগন্ধযুক্ত এই চাল পোলাওয়ের জন্য প্রসিদ্ধ।

৯.১.৩০ **এম. পি. আর এস-৩ (আডিড) :** দার্জিলিং-এর স্থানীয় জাত থেকে নির্বাচিত এই ধান ১৯৬৫ সালে সাধারণের ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত হয়। অন্যান্য চরিত্র :—এম. পি. আর. এস-এর মত। অবশ্য ১৫০০ মিটার উঁচু জমিতেও লাগান যায়। মাঝারি দানার ধান এবং ১০০০টি দানার ওজন ১৯০ গ্রাম। এই ধান থেকে চিড়ে ভাল হয়।

৯.২.১ **বর্তমানে প্রচলিত ধান : আই. ই. টি. ৮২৬ :** এই ধান কেন্দ্রীয় ধান্য গবেষণা সংস্থা থেকে নির্বাচিত হয় এবং ডাঙ্গা জমিতে বোনা ও সেচসেবিত এলাকায় রোয়া করা যায়। এই প্রকারের ধান বৎসরের বেশীর ভাগ সময়েই লাগান যায়। বোরো হিসাবে ১৫০-১৬০

দিনে পাকে ও অন্যান্য সময় ১০৫-১১০ দিনে কাটার উপযুক্ত হয়। গাছ মাঝারি উঁচু হয় ; খড় লম্বা হয় না। দানা ছোট ও সরু। ১০০০টি দানার ওজন ২৬·৪০ গ্রাম। বোরো ধান হিসাবে গড় ফলন ৫·০-৫·৫ টন এবং অন্যান্য সময় ৪·০-৪·৫ টন প্রতি হেকটরে পাওয়া যায়। এই ধান মরচে রোগ, ব্যাকটিরিয়াল ব্লাইট ও খরা সহনশীল। পশ্চিমবঙ্গে সমতল ভূমিতে সর্বত্র লাগান যায়।

৯.২.২ সি. আর. ১২৬-৪২-১ ঃ কেন্দ্রীয় ধান্য গবেষণা কেন্দ্র, কটক থেকে উদ্ভাবিত এই ধান জৈবিক অবস্থায় শীত বা ঠাণ্ডা সহনশীল। এই প্রজাতি বেঁটে জাতের এবং বোনা ও রোয়া করা যায়। আউশের জমিতে অসেচ এলাকায় বোনা যায় ও সেচসেবিত এলাকায় রোয়া যায়। গরমকালে ১০৫-১১০ দিনে ও শীতকালে লাগালে ১৫০-১৫৫ দিনে কাটা যায়। দানা ছোট ও মোটা হয়। ১০০০টি দানার ওজন ২৩·০ গ্রাম। চাল সাদ, শীতকালীন ফসল ৩·৫-৪·০ টন পাওয়া যায়। গরমকালে ৩·০ টন ফলন দেয়। পার্বত্য অঞ্চল ছাড়া অন্যান্য অঞ্চলের জন্য অনুমোদিত।

৯.২.৩ আই. ই. টি.-১৪৪৪ (রসি) ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের ধান্য গবেষণা অধিকরণ, হায়দ্রাবাদ হতে উদ্ভাবিত এই ধান খরা ও ঠাণ্ডা সহনশীল। ধানটি বোনা ও রোয়া করা যায়। ডাঙ্গা জমিতেও এই ধান লাগান যায়। বেঁটে জাতের ধান ; খড় ছোট হয় ; দানা মাঝারি সরু ; ১০০০টি দানার ওজন ২১·৯৫ গ্রাম ; চাল সাদা। বোরো ধান হিসাবে চাষ করে ৩·৫-৪·০ টন ফলন পাওয়া যায়। অন্যান্য সময় ৩ টন ফলন পাওয়া যায়। ডাঙ্গা ও মাঝারি জমির জন্য অনুমোদিত।

৯.২.৪ আই. ই. টি.-২২৩৩ ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের ধান্য গবেষণা অধিকরণ, হায়দ্রাবাদ হতে উদ্‌ভাবিত এই ধান খরা সহনশীল এবং ডাঙ্গা ও মাঝারি জমির জন্য উপযুক্ত। বোনা ও রোয়া করা যায়। শীতকালীন ফসল হিসাবে লাগালে ১৬০-১৬৫ দিনে কাটা যায় ও গরমকালে ১১০-১১৫ দিনে কাটা যায়। দানা সরু ও লম্বা হয় ; ১০০০টি দানার

ওজন ২৩'৯৫ গ্রাম। চালের রং সাদা হয় ; স্বাদ ভাল। শীতকালীন ফসল ৫'০-৫'৫ টন ফলন দেয় ও গরমকালে ৪ টন ফলন দেয়।

৯.২.৫ **সি. এন. এম-৬ (লক্ষ্মী)** চুঁচুড়া ধান্য গবেষণা কেন্দ্র থেকে রঞ্জন-রশ্মির প্রভাবে উদ্ভূত এই ধান সেচসেবিত ডাঙ্গা জমির জন্য উপযুক্ত। ইহা শীতকালে ও লাগান যায়। শীতকালে ১৫৫-১৬০ দিনে কাটা যায় ও গরমকালে ১১০-১১৫ দিনে কাটা চলে। বেঁটে জাতের ধান ; দানা বেঁটে ও মোটা ; ১০০০টি দানার ওজন ২১'৯০ গ্রাম ; চালের রং সাদা। শীতকালীন ফসল ৪'০-৪'৫ টন ও গরমকালে ৩'৫ টন ফলন দেয়। সেচসেবিত এলাকার জন্য অনুমোদিত।

৯.২.৬ **সি. এন. এম-২৫ (রঞ্জন) ঃ** চুঁচুড়া ধান্য গবেষণা কেন্দ্র থেকে রঞ্জন-রশ্মির প্রভাবে উদ্ভাবিত এই ধান সেচসেবিত এলাকার জন্য অনুমোদিত। ইহা বোনা ও রোয়া করা যায়। জাত বেঁটে ; খড় ছোট। গরমকালে ১১০-১১৫ দিনে ও শীতকালে ১৫৫-১৬০ দিনে কাটা যায়। দানা বেঁটে ও মোটা। ১০০০টি দানার ওজন ২৩'৩৩ গ্রাম। চালের রং সাদা। শীতকালে লাগালে ৪'৪-৫'০ টন ও গরমকালে লাগালে ৩'০-৩'৫ টন ফলন দেয়। ইহা পাতা ধসা রোগ সহনশীল।

৯.২.৭ **রত্না ঃ** একটি উচ্চফলনশীল ধান। সেচসেবিত এলাকার জন্য সরকার দ্বারা অনুমোদিত। বেঁটে জাতের ধান। এই জাত শীত-কালীন ; গরমকালেও লাগান যায়। শীতকালীন ফসল ১৬৫ দিনে ও গরমকালে ১১০-১১৫ দিনে কাটা যায়। দানা সরু ও লম্বা হয়। ১০০০টি দানার ওজন ২১'১২ গ্রাম, চাল সাদা। শীতকালীন ফলন ৫'৫-৬'০ টন ও গরমকালে ৪'০-৪'৫ টন পাওয়া যায়। সময়মত ধান না কাটলে অনেক দানা ঝরে যায়।

৯.২.৮ **আই. ই. টি.-৪০১৪ ঃ** হায়দ্রাবাদ কেন্দ্রীয় ধান্য গবেষণা অধিকরণ থেকে উদ্ভাবিত এই ধান রত্নার পরিপূরক। ১০০০টি দানার ওজন ২১'১০ গ্রাম। ফলন রত্নার সমান। ধান ঝরে যায় না। সকল সেচসেবিত অঞ্চলের জন্য অনুমোদিত।

৯.২.৯ আই. আর.-৩৬ : আন্তর্জাতিক ধান্য গবেষণা কেন্দ্র ও ম্যানিলা, ফিলিপিনস্ থেকে উদ্ভাবিত এই ধান প্রায় সকল প্রকারের রোগ পোকা সহনশীল ধান। ইহা বোনা ও রোয়া করা যায়। বেঁটে জাতের ধান এবং দানা সরু ও লম্বা। গরমকালে ১১৫ দিনে ও শীতকালে ১৬০ দিনে কাটা যায়। ১০০০টি দানার ওজন ২৩·১০ গ্রাম ; চাল সাদা। গরমকালে ৫ টন ও শীতকালে ৭ টন পর্যন্ত ফলন দেয়। এখনও পর্যন্ত সকল প্রকার ধানের মধ্যে সবথেকে বেশী ফলন দেয়। সকল সেচসেবিত অঞ্চলের পক্ষে উপযুক্ত এবং বোনা ধান হিসাবে বৃষ্টি নির্ভরশীল অবস্থায় ভাল ফলন দেয়।

৯.২.১০ জয়া : মাঝারী জাতের উচ্চফলনশীল ধান। কেবল সেচসেবিত এলাকায় এই ধান লাগান উচিত। যদিও শীতকালীন ধান হিসাবে এই ধান লাগান যায় ; কিন্তু যেসব ধান গরমকালে ১৩০ দিনে কাটা যায় (জয়া ধান ১৩০ দিনে কাটা হয়) সেই সব ধান শীতকালে লাগান উচিত নয়, কারণ জুন মাসের শেষে কাটা হয় বলে খরিফ ধান লাগান যায় না। মাঝারি জাতের ধান। খড় বড় হয় না, হলেও গোখাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যায়। দানা লম্বা ও মোটা হয়। ১০০০টি দানার ওজন ২৮·১০ গ্রাম। গরমকালে ফলন ৫ টন ও শীতকালে ৬ টন হয়। পশ্চিমবঙ্গের সমতল অঞ্চলের জন্য অনুমোদিত।

৯.২.১১ আই আর.-২০ : আন্তর্জাতিক ধান্য গবেষণা কেন্দ্র থেকে উদ্ভাবিত এই ধান বাদামী শোষক পোকা ও টুংরো রোগ সহনশীল। মাঝারি জাতের ধান। দানা মাঝারি সরু ও ১০০০টি দানার ওজন ১৯·৫০ গ্রাম। কাটতে সময় নেয় ১৩৫ দিন। যদিও শীতকালে এই ধান লাগান যায় কিন্তু সময় (১৭৫) বেশী নেয় বলে না লাগানই ভাল। ৫ টন ফলন গরমকালে পাওয়া যায়। সমতল অঞ্চলের জন্য অনুমোদিত।

৯.২.১২ সি. এন. এম.-৩১ : চুঁচুড়া, ধান্য গবেষণা কেন্দ্র থেকে রঞ্জন-রশ্মির প্রভাবে উদ্ভাবিত এই ধান আই. আর. ২০-র অনুরূপ।

কিন্তু দানা সরু ও লম্বা। ১০০০টি দানার ওজন ২৪·৬০ গ্রাম। ফলনও আই. আর. ২০-র অনুরূপ। সমতল অঞ্চলের জন্য অনুমোদিত।

৯.২.১৩ আই. ই. টি-২২৫৪ঃ এই ধান হায়দ্রাবাদস্থিত কেন্দ্রীয় ধান্য গবেষণা অধিকরণ থেকে উদ্ভাবিত। সি. এন. এম-এর অনুরূপ। এই ধান সরু ও লম্বা ও ১০০০টি দানার ওজন ২১·২০ গ্রাম। ফলন প্রায় ৫ টন। সমতল অঞ্চলের জন্য অনুমোদিত।

৯.২.১৪ আই. ই. টি-২৮১৫ (শম্যশ্রী)ঃ এই ধান হায়দ্রাবাদস্থিত কেন্দ্রীয় ধান্য গবেষণা অধিকরণ হতে উদ্ভূত। আই. ই. টি-২২৫৪-র অনুরূপ। এই ধান টুংরো ও পাতাধসা রোগ সহনশীল। দানা মাঝারি সরু ও লম্বা। চাল সাদা। ১০০০টি দানার ওজন ২৩ গ্রাম। ফলন ৫ টন। বোরো ধান হিসাবে খুব উপযুক্ত নয়।

৯.২.১৫ আই. ই. টি-৬১৪১ (কুন্তি)ঃ হায়দ্রাবাদস্থিত কেন্দ্রীয় ধান্য গবেষণা অধিকরণ থেকে উদ্ভাবিত। মাঝারি জাতের এই ধান সেচসেবিত এলাকার জন্য খুব ভাল। ১৩৫ দিনে এই ধান পাকে। খড়ও ভাল হয়। মাঝারী সরু ও লম্বা দানা; ১০০০টি দানার ওজন ২২·৫০ গ্রাম। অধিক সার প্রয়োগে ফলন বৃদ্ধি হয়। ৫-৫·৫ টন ধান অনায়াসে পাওয়া যায়। সমতল অঞ্চলের জন্য অনুমোদিত।

৯.২.১৬ আই. ই. টি.-৫৬৫৬ (স্বর্ণ)ঃ একই অধিকরণ থেকে উদ্ভাবিত এই ধান মাঝারী ও মোটা। চাল সাদা, মাঝারি নিচু জমির জন্য খুব ভাল। ফলন ৬ টন পাওয়া যায়। ১০০০টি দানার ওজন ২৩·৯০ গ্রাম। চাল সাদা ও সুস্বাদু। বর্তমানে মাঝারি নিচু জমির জন্য সবথেকে ভাল ধান।

৯.২.১৭ সি. এন. এম-৫৩৯ (বিরাজ)ঃ এই ধান চুঁচুড়া ধান্য গবেষণা কেন্দ্র থেকে রঞ্জন-রশ্মির প্রভাবে উদ্ভাবিত। লম্বা জাতের ধান। দেশী ধান থেকে উদ্ভাবিত বলে দেশী ধানের গুণ যেমন, লম্বা ও ভাল খড়, সরু ও লম্বা দানা, ইত্যাদি চরিত্র বর্তমান। গাছ সহজে পড়ে যায়। সামান্য আলোক সংবেদনশীল। ১৬৫ দিনে কাটার উপযুক্ত হয়।

ফলন ৫ টন। নীচু জমির উপযুক্ত। ১০০০টি দানার ওজন ১৮.৯৭ গ্রাম।

৯.২.১৮ সি. এন-৫৪০ (সুরেশ): চুঁচুড়া ধান্য গবেষণা কেন্দ্র থেকে উদ্ভাবিত। লম্বা জাতের ধান। খড়ও খুব ভাল হয়। ১৬৫-১৭০ দিনে কাটা যায়। দানা সরু ও লম্বা। ১০০০ টি দানার ওজন ২৫.৯৭ গ্রাম। ফলন ৩.৫ টন, চাল সাদা। মুড়ি ও খই ভাল হয়।

৯.২.১৯ **পঙ্কজ**: এই ধান নীচু জমির জন্য অনুমোদিত। ধান পাকতে ১৬০ দিন লাগে। চাল সাদা; দানা ছোট ও মোটা। ১০০০টি দানার ওজন ২৫.৩০ গ্রাম। ফলন ৫ টন পাওয়া যায়।

৯.২.২০ **সি আর-১০১৪**: কেন্দ্রীয় ধান্য গবেষণা কেন্দ্র কটক থেকে উদ্ভাবিত। এই ধান নীচু জমি, যেখানে ৭০-৮০ সেমি পর্যন্ত জল দাঁড়ায়, এইপ্রকার জমির জন্য অনুমোদিত। দানা ছোট ও সরু। খড় ভাল হয়। চাল সাদা ও ১০০০টি দানার ওজন ১৮.২৫ গ্রাম। বর্ধমান অঞ্চলের জন্য অনুমোদিত।

ইহা ছাড়া অতি নীচু জমির জন্য জলধি ১নং, জলধি ২নং ও বন্যা সহনশীল ধান যেমন—জলপ্লাবন, চুঁচুড়া ধান্য গবেষণা কেন্দ্র থেকে উদ্ভাবিত হয়েছে।

৯.৩.১ **ডাঙ্গাজমির উপযুক্ত বোনা ধান**—রসি (আই. ই. টি-১৪৪৪), আই. ই. টি-২২৩৩, আই. ই. টি-৮২৬, কিরণ, আই. ই. টি.-৬২২৩ ও দেশী ধান দুলার।

৯.৩.২ **ডাঙ্গা জমিতে সেচসেবিত এলাকার জন্য**—রসি, আই. ই. টি-২২৩৩, ৮২৬, সি. আর-১২৬-৪২-১, আই. আর-৩৬, ৫০ ও দুলার।

৯.৩.৩ **সেচসেবিত এলাকায় রোয়ার জন্য জলদি জাতের ধান**—লক্ষ্মী, সি. এন. এম-২৫, রত্না, আই. ই. টি-৪০৯৪, আই. আর-৩৬ ও ৫০।

৯.৩.৪ সেচসেবিত এলাকার জন্য মাঝারি জাতের ধান—কুন্তি, শস্যশ্রী, জয়া, স্বর্ণ, আই. আর-২০, সোনালী ও প্রকাশ।

৯.৩.৫ সেচসেবিত ও নীচু জমিতে বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল নাবী জাতের ধান—বিরাজ, সুরেশ, পঙ্কজ, মাশুরী, সি. আর-১০০৯, ১০১০, ১০১২ ও ১০৩৪।

৯.৩.৬ অতি নিচু জমির বোনা ধান—জলধি-১, জলধি-২ ও জলপ্লাবন।

৯.৩.৭ লবণাক্ত জমির জন্য- মোহন কিষাণ ও এস. আর. ২৬ বি।

৯.৩.৮ পাহাড়ী অঞ্চলের জন্য—মৃনাল।

১০। শারীরবিদ্যা (ফিজিওলজি):

ধান গাছ, জাত, পারিপার্শিক পরিবেশ ও লাগাবার জায়গার ভিত্তিতে, বীজ অংকুরিত হওয়া থেকে ধান পাকা পর্যন্ত ৩-৬ মাস পর্যন্ত সময় নেয়। এই সময়ের মধ্যে ধান গাছ তিনটি সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থার মধ্যে অতিবাহিত করে। একটি ১২০ দিন বয়সের ধান গাছের বিভিন্ন অবস্থা দেখান হল।

০ অঙ্কুর হওয়া
চারা লাগানো
পাশকাঠি ছাড়া
সর্ব্বোচ্চ পাশকাঠি
৬০ ভ্রূণ সৃষ্টি
শীষ গঠন
৯০ শীষ বেরুন বা ফুল ফোটা
দুধ অবস্থা
একটু শক্ত (DOUGH)
সোনালী রং ধরা
১২০ পাকা
জৈবিক বৃদ্ধির অবস্থা
বংশবৃদ্ধির অবস্থা
পাকার অবস্থা

কৃষি বিজ্ঞানীরা ধানের জীবনচক্রকে মোটামুটি ভাবে ৩ অংশে বিভক্ত করেছেন।

১০.১ * জৈবিক অবস্থা।
* বংশ বৃদ্ধির অবস্থা।
* পাকার অবস্থা।

১০.১.১ একটি ১২০ দিনের ধান উষ্ণ পরিবেশে লাগালে জৈবিক বৃদ্ধির অবস্থায় ৬০ দিন অতিবাহিত করে, বংশবৃদ্ধির অবস্থায় ৩০ দিন ও পাকার অবস্থায় ৩০ দিন অতিবাহিত করে। বীজ বপন থেকে পাশকাঠি ছাড়া ও গর্ভধারণের পূর্ব পর্যন্ত জৈবিক বৃদ্ধির সময়। এই সময় পাশকাঠি
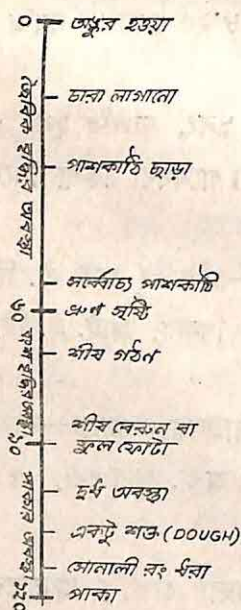
ছাড়া, উচ্চতা বৃদ্ধি, নিয়মিত ভাবে পাতার জন্ম প্রভৃতি কার্য সম্পন্ন হয়। পাতার আয়তন (লিফ্ এরিয়া) ক্রমশঃ বাড়ে ও সূর্যকিরণ বেশী করে গাছ নিতে পারে। সাধারণতঃ মূল কান্ড বা গাছ (যে চারা লাগান হয়
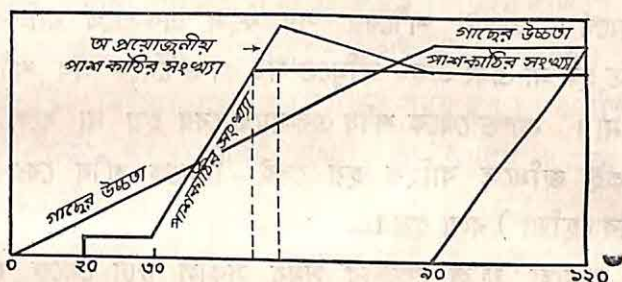
বা যে চারা প্রথমে বাহির হয়) যখন ৫-৬টি পাতা ছাড়ে, সেই সময় থেকে পাশকাঠি বাহির হয়। পাশকাঠির ছাড়ার গতি প্রথমে ধীরে ও ক্রমশঃ বাড়তে থাকে, পরে পাকার অবস্থায় আবার কমতে থাকে। যখন প্রতি বর্গমিটার এলাকায় প্রতি গাছে সব থেকে বেশী পাশকাঠি থাকে তখন ওই অবস্থাকে সর্বোচ্চ পাশকাঠি অবস্থা বলে। নতুন পাশকাঠি ধান কাটার সময়ও বাহির হয়। সেই সব পাশকাঠি থেকে শীষ বাহির হবার নিশ্চয়তা থাকে না।

১০.১.২ **বংশ বৃদ্ধির অবস্থা**ঃ এই সময় গাছের উচ্চতা বৃদ্ধি পায়। পাশকাঠি বেরোনোর হার কমে এবং শীর্ষ পাতা বাহির হয়। শীষের ভ্রূণ সৃষ্টি, শীষ বেরোন ও পরাগ মিলন হয়। সাধারণতঃ শীষ বাহির হবার প্রায় ২৫-৩০ দিন আগে মূল কান্ড (কাল্ম্) ও পাশকাঠিতে শীষের ভ্রূণ সৃষ্টি হয়। কৃষিবিদ্গণ ভ্রূণ সৃষ্টির সময় চাপান সার দেবার পরামর্শ দেন। এই অবস্থা ভ্রূণ দেখা দেবার (ভ্রূণ ১ মিমি লম্বা হলে তবেই দেখা যায়) ৭ দিন আগে শুরু হয়। এই সময় কান্ডের (কাল্ম্) গাঁটগুলির (নোড) মধ্যের দূরত্ব (অন্তঃগাঁট) বৃদ্ধি পায়। গাছের এই অবস্থাকে অন্তঃগাঁট বৃদ্ধির অবস্থা বলে। গাছের কান্ডের উপর দিকে শেষ পাতা থাকে যাকে পতাকা পাতা বলে। শেষ

পাতার পর বাহির হয় শীষ বা প্যানিকিল। কাণ্ড থেকে শীষ বাহির হওয়াকে হেডিং বলে। শীষ থেকে ফুল প্রস্ফুটিত হওয়াকে এনথেসিস্ বলে, হেডিং বা কাণ্ড থেকে শীষ বের হতে ১০-১৪ দিন সময় লাগে। একটা শীষের সব ফুল একসাথে বাহির হয় না বা প্রস্ফুটিত হয় না এবং একই জমিতে সব কাণ্ড থেকে সব শীষ একসাথে বের হয় না। কাণ্ড থেকে শীষ একসাথে বের হয় না বলে ৫০% শীষ যখন একই জমিতে বাহির হয় সেই দিনকে শীষ বের হবার দিন (ডেট অব হেডিং) বলা হয়।

উষ্ণ অঞ্চলে ফুল ফোটার সময় সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা। পরাগ মিলন ফুল ফোটার ঠিক আগে হয় ও প্রায় ৫-৬ ঘণ্টায় পরাগ মিলন ও গর্ভসঞ্চার হতে সময় নেয়। কদাচিত পরাগ মিলন বিকাল-বেলায় হয়। সেইজন্য বিকালেও কদাচিৎ ফুল প্রস্ফুটিত হয়। তবে পরিবেশ ঠাণ্ডা হলে বা শীতকালে প্রস্ফুটনের কাজ অধিক বেলায় শুরু হয় এবং তা বিকাল পর্যন্ত চলতে থাকে। প্রায় সব প্রকার ধানের প্রজাতির প্রস্ফুটন হতে ৭-১০ দিন সময় নেয় ; কিন্তু অধিকাংশের ৫-৬ দিনের মধ্যে সম্পন্ন হয়।

১০.১.৩ **পাকার অবস্থা :** ধান পাকতে প্রায় ৩০ দিন সময় নেয়। প্রথমে দুধ অবস্থা হয় : যখন দানার ভেতরে দুধের মতন পদার্থ থাকে। টিপলে দুধ বের হয়। এই সময়কে দুধ অবস্থা বলে। পরবর্তী পর্যায়ে দানা একটু শক্ত হয় কিন্তু নরম থাকে ; টিপলে দুধের মতন পদার্থ বের হয় না। একে সফট ডাফ্‌স্টেজ বলে। এর দিন কয়েক পরে দানা শক্ত হয়। একে পুষ্ট দানা বা হার্ড ডাফ্‌স্টেজ বলে। দানার রং তখনও সবুজ বা হালকা সবুজ থাকে, এরপর দানার রং হলুদ হতে শুরু করে। সেই সাথে কাণ্ডের নীচের বয়স্ক পাতা হলুদ হয়ে পাকতে শুরু করে। এই অবস্থাকে ধানের পাক ধরা বা সেনেসেন্স বলে। এই সময় থেকে ধানের দানা আকারে ও ওজনে বৃদ্ধি পেতে থাকে ; রং-এর পরিবর্তন হয়। যত বয়স বাড়ে ততই গাছের ও

দানার জলীয় অংশ কমতে থাকে ও শুকনো ওজন (ড্রাই ওয়েট) বাড়তে থাকে।

১০-২ ধানের জীবনচক্র, প্রাকৃতিক পরিবেশ, চাষের পদ্ধতি ও ব্যবস্থার চাপে সামান্য পরিবর্তন হতে পারে। তবে বংশবৃদ্ধির ধরন ও সময় এবং পাকার সময় মোটামুটি অপরিবর্তিত থাকে। জৈবিক বৃদ্ধির সময়-সীমা বিভিন্ন প্রজাতির বিভিন্ন সময় হয়। জলদি জাতের ধানের জৈবিক পরিবর্তনে কম সময় লাগে। সে কারণে তাদের শীষের ভ্রূণ সৃষ্টি (প্যানিকেল ইনিসিয়েসন) সর্বোচ্চ সংখ্যার পাশকাঠি সম্পূর্ণ ভাবে বের হবার আগে শুরু হয়। শীষ বেরোবার সময় বিস্তৃত হয়। ফলে শেষেব দিকের পাশকাঠি থেকেও শীষ (প্যানিকেল) বের হয়।
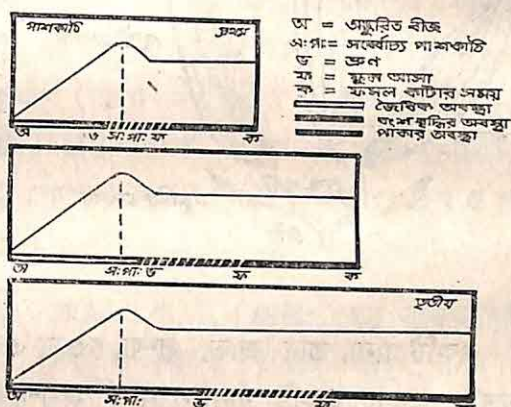
নাবি জাতের ধানের জৈবিক রূপান্তর ঘটতে বেশী সময় লাগে। সেই কারণে সর্বোচ্চ পাশকাঠি ছাড়ার সময়ের পরে শীষের ভ্রূণ তৈরী হয়। এই অবস্থাকে ল্যাগ ভেজিটেটিভ স্টেজ বলে। যখন জৈবিক অবস্থা স্বাভাবিক হয় তখন ধানের কাণ্ড থেকে শীষের ভ্রূণ, সর্বোচ্চ পরিমাণ পাশকাঠি বেরোবার সময়ের ঠিক অব্যবহিত পরে বের হয়। ইহা সাধারণতঃ ১২০ দিনের জাতে লক্ষ্য করা যায়।

১০.৩ **বীজ ও অঙ্কুর :** ধান বা ধূসর রং-এর খোসা দিয়ে ঢাকা যে দানা আমরা দেখতে পাই তাকে বীজ বলা হয়। চাল বা ফল যে অংশ খোসা দিয়ে ঢাকা থাকে এবং ওই অংশ আমরা খেয়ে থাকি তাকে ক্যারিয়পসিস বলা হয়। একে বাদামী চাল বলা হয়। এই বাদামী

রং-এর চাল চালকল থেকে পালিস্ করে সাদা করে তবে বাজারে বিক্রয় করা হয়। আজকাল অবশ্য অধিকাংশ প্রজাতিতে বাদামী রং থাকে না। খোসা ছাড়ালে সাদা চাল বাহির হয়।

চালের দুটি অংশ (১) ভ্রূণ ও (২) স্বেতসার। খোসার বাহিরের ঢাকনা ও ভেতরের ছোট ঢাকনা। বাহিরের ঢাকনা ভেতরের ছোট ঢাকনার $\frac{২}{৩}$ অংশ ঢেকে রাখে। ছোট ঢাকনাটি চালকে ধরে রাখে একটি ছোট অংশ দিয়ে। ছোট ঢাকনাটি চালকে প্রায় $\frac{২}{৩}$ ভাগ ঢেকে রাখে। বড় ঢাকনা ও ছোট ঢাকনা চালের $\frac{১}{৩}$ ভাগ ঢেকে রাখে। দানার গঠন শক্ত করতে সাহায্য করে।
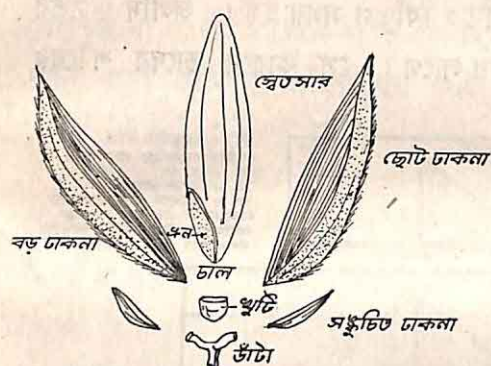
একটি দানা, তার জাত, লম্বা, চওড়া এবং কতটা মোটা তার উপর নির্ভর করে। একটা দানা সম্পূর্ণ জলশূন্য অবস্থায় ১২-৪৪ মিলি গ্রাম পর্যন্ত ওজনের হয়। খোসার ওজন দানার ওজনের প্রায় ২১% হয়।

১০.৩.১ **দানার সুপ্ত অবস্থাঃ** প্রায় সব ভারতীয় প্রজাতি, আলোক সংবেদনশীল। পাকার পরে কয়েক সপ্তাহ ধরে সুপ্ত অবস্থায় বা ঘুমিয়ে থাকে। ইহার অর্থ ধান কাটার পরে আবার জমিতে লাগালে বা বীজতলায় ফেললে অংকুরিত হয় না। ইহা একটি ভাল গুণ কারণ উষ্ণ অঞ্চলে যখন মাঝে মাঝে ধান কাটার সময় বৃষ্টি হয় তখন বীজ অংকুরিত হলে বীজ নষ্ট হয়। এই সময় তাপমাত্রাও বীজ অংকুরিত হওয়ার সহায়ক নয়। যেসব জাত সামান্য বা খুব অল্প সুপ্ত গুণ-সম্পন্ন, সেইসব জাত সাধারণতঃ ধান পাকার সাথে সাথে জল পেলে বা জমিতে ধানগাছ পড়ে গেলে, গাছে থাকা অবস্থায় শীষের দানা

অংকুরিত হয়। যদি সুপ্ত ধানকে ৫০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ৪-৫ দিন রাখা অথবা ০·১% নাইট্রিক অ্যাসিডের দ্বারা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় রাখা যায় তাহলে সুপ্ত অবস্থা দূর হয়। মূলতঃ বীজ ধানের খোলসের মধ্যে দিয়ে যখন জল প্রবেশ করতে পারে না তখনই অংকুরোদগম ক্ষমতা থাকে না বা সুপ্ত অবস্থা সৃষ্টি হয়।

১০.৩.২ **অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা :** বীজ তখনই অংকুরিত হয় যখন বীজের সুপ্তাবস্থা দূর হয় বা খোসা অথবা খোলসের মধ্য দিয়ে জল প্রবেশ করতে পারে ও ধান ১০-৪০° সেলসিয়াস্ তাপমাত্রার সংস্পর্শে আসে। জলের সংযোগের সাথে সাথে বীজ জলগ্রহণ করতে থাকে ও প্রথম ১৮ ঘণ্টায় সর্বাধিক (প্রায় ২৫-৩০%) জল গ্রহণ করে। অংকুরিত হবার সময় ও তাপমাত্রা পরিবর্তনের সাথে সাথে ৩০-৪০% জল গ্রহণ করে। এই সময় খোসা ভেদ করে অংকুর বাহির হয় ও প্রথম পাতা বেরোতে সাহায্য করে।

১০.৩.৩ **চারা :** বীজ জমিতে বা জলে দেবার পরে অংকুর বাহির হওয়ার সাথে সাথে প্রথম পাতা ও শিকড় বাহির হয়। নির্ধারিত সময়ের সাথে সাথে একটি দুটি করে পাতা বাহির হয়, মূল শিকড় ও শাখা শিকড় বাহির হয়—ইহাকে চারা বলা হয়।

১০.৩.৪ **পাতা :** একটি ধান গাছের বয়স পাতা থেকে বোঝা যায়। কৃষি আবহাওয়া, পরিবেশ ও জলের উপর পাতার গঠন ও বৃদ্ধি বহুলাংশে নির্ভর করে। একটি পাতা সম্পূর্ণ লম্বা হবার পর আবার পরের পাতা বাহির হয়। গাছের বয়স সেইজন্য পাতার সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করা যায়। যেমন একটি ধান গাছে যদি ৫টি পূর্ণ গঠিত পাতা

থাকে ও ৬নং পাতা এখনও সম্পূর্ণ বৃদ্ধি পায়নি এমনও দেখা যায়, তাহলে সেই গাছের বয়স ৫.৫ হিসাবে প্রকাশ করা যায়। বীজের মধ্যে খাদ্য সঞ্চিত থাকে। তা গাছের ৫ পাতা পর্যন্ত বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এ সময়ের আগে চারা গাছের সালোকসংশ্লেষের ক্ষমতা থাকে না। পাতার আয়তন (লিফ্ এরিয়া) যা হয় তার সাহায্যে সালোকসংশ্লেষের দ্বারা খাবার তৈরী করতে আরম্ভ করে। সূর্য কিরণ ও উত্তাপের (২২-৩১° সেলসিয়াস) সাহায্যে বীজের অঙ্কুরিত হবার ১ সপ্তাহ পর্যন্ত কেবল মাত্র ৩০% খাদ্য তৈরী করতে পারে। দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রায় ৮০% খাদ্য তৈরী করে এবং তৃতীয় সপ্তাহ থেকে ৯৫% খাদ্য তৈরী করে। চতুর্থ সপ্তাহ থেকে গাছ নিজের খাদ্য তৈরীতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে।

১০.৪.। চারার বৃদ্ধিতে বিভিন্ন উৎপাদকের ভূমিকা ঃ

১০.৪.১ **তাপমাত্রা ঃ** বীজ অঙ্কুরিত হবার পর তাপমাত্রার সামান্যতম প্রভেদ চারা বৃদ্ধিতে প্রভাব বিস্তার করে। ২২—৩১° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় চারার বৃদ্ধি হয়। গবেষণালব্ধ তথ্য থেকে জানা যায় যে ২৫—৩০° সেলসিয়াস হল চারার বৃদ্ধির অনুকূল তাপমাত্রা। ৪০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় চারার মৃত্যু ঘটে ও ১০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় চারা ও শিকড় উভয়ের বৃদ্ধি বন্ধ হয়।

১০.৪.২ **আলো ঃ** অন্ধকারে অঙ্কুরিত বীজ থেকে শিকড় ও প্রথম দুটি পাতা দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

১০.৪.৩ **অক্সিজেন ঃ** ধান অক্সিজেন বিহীন পরিবেশে অঙ্কুরিত হতে পারে। কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে অক্সিজেনের প্রতি অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। জলা জমিতে বা যে জমিতে অধিক পরিমাণে জল পায়, যেখানে অক্সিজেনের সরবরাহ অতিমাত্রায় সীমিত, সেখানে বীজ অঙ্কুরিত হয় ; কিন্তু পরবর্তীকালে শিকড় বা প্রথম দুটি পাতা জন্মায় না বা জন্মালে তাদের বৃদ্ধি হয় না। সাধারণভাবে বলা যায় যে ১—২ পাতা বৃদ্ধির জন্য ন্যূনপক্ষে ৫—৬ লক্ষাংশ অক্সিজেন জমিতে

থাকা একান্ত প্রয়োজন। নীচু জমির ধানচাষে অক্সিজেনের অপ্রতুলতার জন্য চারা ভাল বাহির হয় না। এই কারণে বীজ বপনের আগে বীজের বহিরাবরণে ক্যালসিয়াম পার-অক্সাইড প্রয়োগ করে বীজ থেকে চারা বাহির হওয়া ও বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক হয়। রাসায়নিক বিক্রিয়াটি এইরূপ :

২ ভাগ ক্যালসিয়াম্ পার-অক্সাইড + ২ ভাগ জল — ২ ভাগ ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড + অক্সিজেন ↑
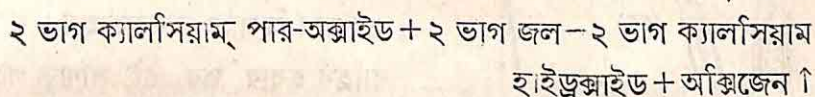
এই মুক্ত অক্সিজেন চারা বৃদ্ধির সহায়ক হয়।

১০.৪.৪ **জলের স্তর :** রোয়া ধানের বীজতলা সাধারণতঃ নীচু জমিতে হয়ে থাকে তবে উঁচু বা ডাঙ্গা জমিতেও বীজতলা তৈরী হয়। ডাঙ্গা বীজতলার চারার শিকড় তাড়াতাড়ি বাড়ে ও চারার লাগানর পর শীঘ্র নিজেকে মানিয়ে নেয়। ডাঙ্গা জমির চারার পাতা ছোট হয় ও অনেক শাখাবিশিষ্ট শিকড় হয়। এই চারাতে নাইট্রোজেন ও শর্করা বেশী থাকে। ডাঙ্গা জমির চারা অল্প জলে তৈরী হয় বলে উপরের গুণগুলি পাওয়া যায়। কাদা করা বা নীচু জমিতে তৈরী চারার উপরের গুণগুলি তুলনামূলক ভাবে অনেক কম। কিছু কিছু জায়গায় অঙ্কুরিত বীজ অল্প জায়গায় কলাপাতা বা পলিথিন চাদরের উপর ও কখনও কখনও সিমেণ্ট বাধান জায়গার উপর তৈরী করা হয়। নিয়মিত ও প্রয়োজনীয় জল দেওয়া হয়। চারা ৯—১৪ দিনের মধ্যে তৈরী হয়। ইহা "ড্যাপোগ পদ্ধতি'' হিসাবে প্রচলিত। এই চারা, বীজের মধ্যে যে খাবার থাকে তার সাহায্যে তৈরী হয়।

১০.৫ **পাতা :** ধান গাছের পাতার ৪টি অংশ :

১। পত্র আবরণী বা লিফ্ সীথ।

২। ফলক বা লিফ ব্লেড।

৩। বহির্কান বা অরিকল।

৪। লিগিফুল।

১০.৫.১ **পত্র আবরণী :** অনেকটা ফিতের মতন লম্বা ও মোড়ানো অবস্থায় থাকে এবং কাণ্ড ও পত্রকে ঢেকে রাখে। যদিও এই

অংশ খাদ্য উৎপাদনে কোন সাহায্য করে না কিন্তু পাতার বৃদ্ধি থেকে শীষের ভ্রূণ সৃষ্টি হওয়া পর্যন্ত (যেহেতু তখনও কাণ্ড মজবুত হয় না) চারা গাছকে মজবুত করে ধরে রাখে। ইহা ছাড়া অস্থায়ী খাদ্য ভাণ্ডার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ফুল বাহির হবার পর এই সঞ্চিত খাদ্য দানা পুষ্টির জন্য ব্যবহৃত হয়।
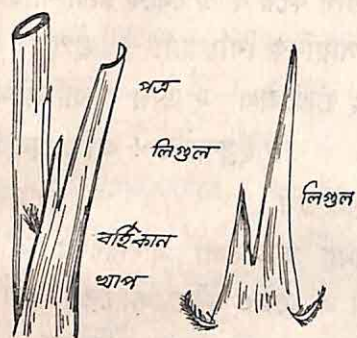
১০.৫.২ **ফলক**ঃ ফলক বা পাতা সরু লম্বা ও চ্যাপটা হয়। সাধারণতঃ ২য় পাতা ছাড়া অন্যান্য পাতার আবরণী লম্বা হয়। পাতার কাজ মূলতঃ গাছের খাবার তৈরী করা। উপর থেকে অর্থাৎ পতাকা পাতা থেকে ৩য় ও ৪র্থ পাতা সব থেকে বেশী খাবার তৈরী করে এবং বললে অত্যুক্তি হবে না যে এই ৩য় ও ৪র্থ পাতা হল ধানগাছের শারীরতত্ত্বের কেন্দ্রবিন্দু। গাছের বৃদ্ধির সাথে সাথে শারীরতত্ত্বের কেন্দ্রবিন্দুর পরিবর্তন হয় ও শেষ পাতা বা পতাকা পাতা সব থেকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পতাকা পাতা শীষে খাদ্য প্রেরণ করে, যার জন্য দানা পুষ্ট হয় ও ওজন বাড়ে। গাছের নীচের দিকে ৬-৭ পাতা যা খাদ্য তৈরী করে তা শিকড়ের দিকে পাঠায়। আলোক সংবেদনশীল (দেশী জাতের) পাতার সংখ্যা ১১—২৩ পর্যন্ত হয়। উচ্চফলনশীল (যে গাছ আলোক সংবেদনশীল নয়) গাছের পাতার সংখ্যা ১০-১৮ পর্যন্ত হয়। সাধারণতঃ শীষ তৈরীর আগে একটা পাতা তৈরী হতে মোট ১০০° সেলসিয়াস তাপমাত্রা লাগে ও পরের দিকে ১৭০° সেলসিয়াস লাগে। এই কারণে দৈনিক গড় তাপমাত্রা যদি ২০০° সেলসিয়াস হয় তাহলে একটা পাতা তৈরী হতে ৫ দিন বা (১০০ ÷ ২০ = ৫) লাগে অথবা যদি দৈনিক গড় তাপমাত্রা ২৫° সেলসিয়াস হয়

তাহলে ৪ দিন লাগবে। অনুরূপভাবে শীষের ভ্রূণ সৃষ্টির পরে এই এক তাপমাত্রায় (১৭০÷২০=৮·৫) বা (১৭০÷২৫=৬·৫) ৭-৯ দিন লাগবে। পাতার বয়সও প্রথমদিকে কম হয় ও গাছের আয়ুর বৃদ্ধির সাথে পাতার আয়ুও বাড়ে। পতাকা পাতার আয়ু সব থেকে বেশী হয়। প্রায় ৩০-৪০ দিন।

পাতার আবরণী ও ফলক যেখানে যুক্ত হয়েছে সেই জায়গাটায় একটা দাগ দেখা দেয়, তাকে বলা হয় **কলার**। এই কলারের পাশ থেকে দুটি রোয়া যুক্ত কাস্তের মতন অংশ থাকে তাকে বহির্কল অথবা **অরিকুল** বলে ও পাতলা ফিতের মতন অংশ যার গোড়ার দিক চওড়া ও উপরের দিক সরু ও দু ভাগে বিভক্ত তাকে লিগুল বলে। এই অরিকুল ও লিগুল হল ধানগাছের বিশেষত্ব যদিও ধান ঘাস সম্প্রদায়ভুক্ত কিন্তু অন্যান্য ঘাসে এই অরিকল বা লিগুল থাকে না। কোন কোন ধান-গাছেও লিগুল থাকে না তাদের লিগুলবিহীন ধান বলে।

১০.৫.৩ **কাণ্ডঃ** কাণ্ড বা কাল্ম্ কতকগুলি গাঁট বা পর্ব ও অন্তঃগাঁট বা অন্তঃপর্ব দিয়ে তৈরী। এই কাণ্ড গাছকে সোজা হয়ে থাকতে সাহায্য করে। কাণ্ডের কিছু অংশ আবরণী দিয়ে ঢাকা থাকে ও শীষ বের হলে কাণ্ডের কিছু অংশ আবরণীর বাহিরে প্রকাশ পায়। সাধারণতঃ একটা ধানগাছের প্রতি পর্ব হতে একটি করে পত্র বাহির হয় ও আরও দুটি গাঁট বা পর্ব বেশী থাকে। একটি অঙ্কুরিত ধানের গোড়ায় ও অন্যটি শীর্ষের নীচে থাকে। উদাহরণ হিসাবে যদি কোন গাছে ১৫টি পত্র বা ফলক থাকে, তাহলে ঐ গাছের মোট ১৭টি গাঁট বা পর্ব থাকবে। কাণ্ডের শীষের দিকের অন্তঃগাঁটের দূরত্ব বেশী হয় ও নীচের বা গোড়ার দিকের অন্তঃগাঁটের দূরত্ব কম হয়। ধানগাছের উচ্চতা গাছের গোড়া থেকে পতাকাপত্রের অগ্রভাগ পর্যন্ত মাপা হয়। কাণ্ডের উচ্চতা নিরূপণ হয় গাছের গোড়া থেকে শীষের নিকট যে গাঁট থাকে সেই পর্যন্ত। এই মাপ সেণ্টিমিটারে প্রকাশ করা হয়।

অন্তঃগাঁটের দূরত্ব বৃদ্ধির সাথে গাছের বৃদ্ধির যোগসূত্র আছে।

শীষের ভ্রূণ উৎপত্তির কাছাকাছি অন্তঃগাঁটের বৃদ্ধি শুরু হয় (জলদি ও মাঝারি জাতের ধানের)। কিন্তু নাবি জাতের ধানের ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধি ভ্রূণ উৎপত্তির আগেই শুরু হয়। আলোক সংবেদনশীল জাতের আলোক বৃদ্ধির সাথে সাথে অন্তঃগাঁটের সংখ্যা ও দূরত্ব উভয়েরই বৃদ্ধি হয়ে থাকে। অসংবেদনশীল জাতের এইরূপ অন্তঃগাঁটের সংখ্যা বা দূরত্বের বৃদ্ধি হয় না। অস্বাভাবিক পরিবেশে যেমন গভীরে বীজ বপন বা গভীর জলে চারা লাগালে অন্তঃগাঁটের দূরত্ব বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া জলাজমিতে রোয়া চারার অ'তগাঁটের দূরত্ব বৃদ্ধির দৈনিক হার ২-১০ সেমি পর্যন্ত হয় ও সর্বাধিক ২৫ সেমি পর্যন্ত হবার খবর পাওয়া যায়। অন্তঃগাঁটের নীচের দিকের দূরত্ব ৪ সেমি বেশী হলে ও প্রজাতির হাঁটু ভাঙ্গা বা শুয়ে পড়ার স্বভাব থাকলে ধানগাছ পড়ে যায়।

১০.৫.৪ **বিয়ান বা পাশকাঠি ঃ** জৈবিক বৃদ্ধির সময় ধানগাছে যে সব শাখা গাছের গোড়ায় গাঁট থেকে বাহির হয় তাদের পাশকাঠি বলা হয়। নিয়মমাফিক বীজ থেকে যে কাণ্ড বাহির হয় তার পাঁচ পাতা বয়সের সময় ওই কাণ্ডের ২য় পাতার গাঁট থেকে প্রথম পাশকাঠি বাহির হয়। প্রথম পাতা থেকে কোন পাশকাঠি বাহির হয় না। এইভাবে
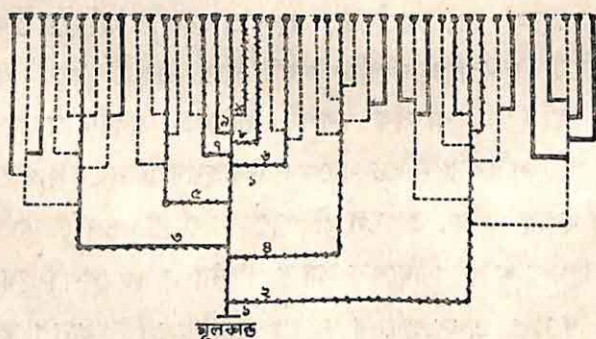
প্রথম পাশকাঠি থেকে আবার ২য় স্তরের পাশকাঠি বাহির হয়। যদি কোন মূল কাণ্ড থেকে ১৩টি পত্র বাহির হয় ও নিয়মমাফিক সব পাশকাঠি বাহির হয় তাহলে মোট ৪০টি পাশকাঠি হয় ; তার মধ্যে ৯টি মৌলিক,

২১টি মধ্যম ও ১০টি তৃতীয় শ্রেণীর পাশকাঠি হয়। তবে কখনই সব পাশকাঠি বাহির হয় না। কিছু সুপ্ত অবস্থায় থেকে যায়। চারা লাগাবার দূরত্ব, গভীরতা, খাদ্যের অপ্রতুলতা বা অসামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহার, প্রয়োগ পদ্ধতি যেমন ফসফরাস কম থাকার জন্য পাশকাঠি কম বেরোবার অন্যতম কারণ। বোনা ধানের পাশকাঠি ২-৫ হয়ে থাকে ও রোয়া ধানের পাশকাঠির সাধারণতঃ ১০-৩০টি করে হয়।

১০.৫.৫ শিকড় ঃ ধানের তিন প্রকার শিকড় হয় ঃ

* মৌলিক বা প্রথম।
* মধ্যম।
* গুচ্ছ মূল।

এই তিন প্রকারের শিকড়ের মধ্যে প্রথম বা মৌলিক শিকড় বীজ অঙ্কুরিত হবার পর প্রথমে বাহির হয়। এবং মৌলিক মূল বা শিকড় গাছের সাত পাতা পর্যন্ত থাকে ও খাদ্য সংগ্রহ করে। মধ্যম মূল সাধারণতঃ বাহিরে হয় না তবে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বা বীজ মাটির গভীরে চলে গেলে এই প্রকারের মূল বা শিকড় বাহির হয়। এই কারণে মূলতঃ তৃতীয় প্রকারের শিকড় বা গুচ্ছ মূল প্রকৃতপক্ষে ধানের শিকড় বলা চলে। ইহাকে গুচ্ছমূল বা গাঁটমূলও বলা হয়। প্রতি গাঁট থেকে ১৫-২৫টি শিকড় বাহির হয়। যেসব শিকড় কাণ্ড বা গাঁট থেকে সরাসরি বাহির হয় তাদের প্রাথমিক শিকড় বলে। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক শিকড় থেকে মাধ্যমিক শিকড় বাহির হয় এবং পরবর্তী পর্যায় মাধ্যমিক শিকড় থেকে তৃতীয় স্তরের শিকড় বাহির হয়। নীচু জমিতে ধানের ছয় স্তর পর্যন্ত শিকড় বাহির হয়। ডাঙ্গা জমিতে ধানের শিকড় ১ মিটার বা ১০০ সেমি পর্যন্ত গভীরে প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু কাদা জমিতে যেহেতু বাতাস বেশী গভীরে যেতে পারে না ও শিকড় অক্সিজেন-এর সংস্পর্শে আসে না সেই সব জমিতে শিকড় ৪০ সেমি (১০") বেশী গভীরে যেতে পারে না। শিকড় কত হয় তারও একটা আন্দাজ পাওয়া যায়। একটা ধান গাছকে যদি বাক্সের

মধ্যে লাগান যায় এবং শিকড় বাক্স থেকে বেরিয়ে না যায় ও গাছের ফুল আসা পর্যন্ত যেসব শিকড় বাহির হয় ও তাদের পরস্পর জোড়া লাগান যায় তাহলে প্রায় তিন কিলোমিটার পর্যন্ত লম্বা শিকড় পাওয়া যাবে। এক বর্গমিটার আয়তক্ষেত্রের ডাঙ্গা জমি থেকে একটা ধান গাছ সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক অনুকূল অবস্থায় ১৫-৩৪ কিলোমিটার পর্যন্ত লম্বা শিকড় তৈরী করে।

১০.৫.৫.১ **শিকড়ের জল ও খাদ্য সংগ্রহ :** শিকড়ের অগ্রভাগ বা টুপি (রুট ক্যাপ) শিকড়ের মাটির ভেতরে প্রবেশ করতে সাহায্য করে। এই টুপি ১০ পাউণ্ড চাপ সৃষ্টি করতে সক্ষম। এই কারণে শক্ত মাটি কিংবা বাড়ির দেওয়ালেও শিকড়ের প্রবেশ অনেক সহজ হয়। এই টুপির জল বা খাবার গ্রহণের কোন ভূমিকা নেই। তার ঠিক উপরের অংশে জল বা খাবার কিছুই প্রবেশ করতে পারে না। এর উপরের অংশে সামান্য জল ও খাবার প্রবেশ করে। তার উপরের অংশ অন্যান্য অংশ থেকে বড় এবং এই অংশে সব থেকে বেশী জল ও খাবার সংগ্রহ করে। তার উপরের অংশে অল্প জল ও খাবার সংগ্রহ করে থাকে। বয়স্ক শিকড় (৬০%) নতুন শিকড় (৪০%) অপেক্ষা বেশী জল ও খাবার সংগ্রহ করে।
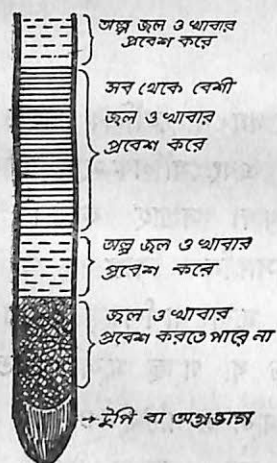
১০.৫.৫.২ **শিকড়ের সহনশীলতা :** ধান গাছের শিকড় নীচের দিকে ও চারপাশে দুই দিকেই বৃদ্ধি পায়। সব ধানের শিকড় সমান বৃদ্ধি পায় না। কোন অগভীর শিকড় হয় এমন জাতের ধান যখন জলা জমিতে হয় এবং একটি এমন জাতের ধান যার শিকড় গভীরে যায় ও তাকে ডাঙ্গা জমিতে লাগান হয় তখন এই দুই জাতের ধানের শিকড়ের সংখ্যা ও ঘনত্ব

৩০ সেমি পর্যন্ত মাটির নীচে একই রকম হয়। কিন্তু যখন এই দুই জাতের ধানের শিকড় মাটিতে ৩০ সেমির নীচে চলে যায় তখন এদের সংখ্যা বা ঘনত্বের তারতম্য বা প্রভেদ দেখা যায়। এই তারতম্য ওই জাতের খরা সহনশীলতার উপর নির্ভর করে থাকে। আই. আর.-২০ জাতীয় বেঁটে জাতের ধানের শিকড় বেশী গভীরে যেতে পারে না। কিন্তু এন. সি. ৬৭৮ বা ভাসামানিক ধানের শিকড় অনেক বেশী গভীরে যেতে পারে।

১০.৬ জৈবিক অবস্থা থেকে বংশবৃদ্ধির অবস্থার ধারাবাহিক পরিবর্তন : ধান গাছের শীষ এবং ভ্রূণ সৃষ্টি শুরু হয় তখন, যখন একটি প্রাকৃতিক এবং দৈহিক অবস্থার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। কাণ্ডের অগ্রভাগে এই ভ্রূণের সৃষ্টি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ফুল বার হবার ৩০ দিন আগে দেখা যায়। যদিও এই ভ্রূণের সৃষ্টিতে আবহাওয়া ও জাতের জন্য অলপ বিস্তর প্রভেদ দেখা দেয় তবে সাধারণ ভাবে সকল অবস্থায় এই সময় ৩০ দিনের মধ্যে হয়ে থাকে। জলদি জাতের ধানে সামান্য কম ও নারী জাতের ধানে সামান্য বেশী সময় লাগে। সূর্যের আলো অর্থাৎ সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যে সময় হয় তাকে আলোর সময় বা ফটো পিরিয়ড বলে। ধানকে একটি ছোট দিনের বা সর্ট ডে ফসল হিসাবে গণ্য করা হয়। আসল কথা এই যে ধান বেশী অন্ধকারের (নিকটো পিরিয়ড) ফসল। এর দৈহিক প্রক্রিয়া রাত্রের উপর বেশী নির্ভরশীল। সেই কারণে ইহা বুঝবার জন্য ছোট দিনের বা সর্ট ফসল বলা হয়।

১০.৬.১ জৈবিক বৃতি : ধানের জৈবিক বৃদ্ধির অবস্থা দুই অংশে বিভক্ত (১) মৌলিক জৈবিক অবস্থা ও (২) আলোক সংবেদনশীল অবস্থা।

১০.৬.১.১ মৌলিক জৈবিক অবস্থা : ধানের চারার প্রথম অবস্থায় (প্রথম ১০ দিন পর্যন্ত) আলোর কোন প্রতিক্রিয়া হয় না। কিংতু শীষের ভ্রূণে তৈরী পর্যন্ত ছোট দিনের দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং

এই অবস্থাকে মৌলিক জৈবিক অবস্থা বলে। সাধারণতঃ ১০-৬৩ দিন পর্যন্ত এই অবস্থা পাওয়া যায় ; তবে কোন অবস্থাতে ১০০ দিনের বেশী হয় না।

১০.৬.১.২ আলোক সংবেদনশীল অবস্থা ঃ মৌলিক জৈবিক অবস্থার পর ধানগাছ আলোক সংবেদনশীল অবস্থায় প্রবেশ করে। আলোক সংবেদনশীল নয় এমন জাতের ধানের আলোক সংবেদনশীল অবস্থা কখনও ৩০ দিনের বেশী হয় না। কিন্তু আলোক সংবেদনশীল ধানের ওই অবস্থা ৩০ দিনের বেশী হয়। সকল জাতের ধানের প্রয়োজনীয় দৈনিক আলোর সময় ৯-১০ ঘণ্টা। আলোর সময় বেশী বা কম হলে ফুল আসতে দেরী হয়। কতটা দেরী হয় তা নির্ভর করে ঐ জাত কতটা আলোক সংবেদনশীল তার উপরে। আবার ১২-১৪ ঘণ্টার বেশী সময় হলে ফুল আসে না।

কম আলো সংবেদনশীল-এর রূপরেখা—

```
      ১          ২           ৩
□────────□──────────□──────────□ ১০ ঘণ্টা আলোয় জীবন চক্র
      ১          ২           ৩
□────────□──────────□──────────□ ১৪   ”    ”    ”    ”
```

বেশী আলো সংবেদনশীল-এর রূপরেখা

```
      ১          ২           ৩
□────────□──────────□──────────□ ১০   ”    ”    ”    ”
               ১               ২        ৩
□──────────────────────────□────────□────────□ ১৪ ঘণ্টা আলোয় জীবন চক্র
 মৌ. জৈ অ লো. ভে স্টে
```
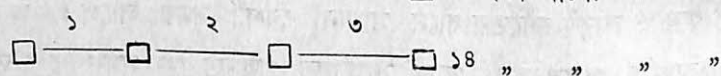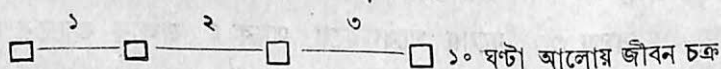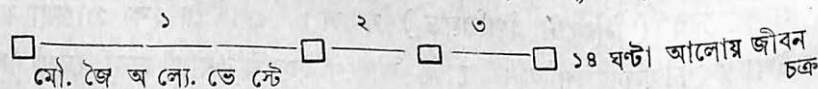
(উৎস ঃ ভেরগের ও জেনিংস ১৯৬৩)—

১০.৭ ধান গাছের উপর আলোর প্রতিক্রিয়া	**চরিত্র**
১। কোন প্রতিক্রিয়া নাই বা ইনসেনসিটিভ	অত্যন্ত ছোট পি. এস. পি. বা আলোক সংবেদনশীল অবস্থা (৩০ দিনের কম) ও বি. ভি. পি. বা মৌলিক জৈবিক অবস্থা অল্প থেকে বেশী।

ধান গাছের উপর আলোর প্রতিক্রিয়া	চরিত্র
২। সামান্য প্রতিক্রিয়া বা উইকলি সেনসিটিভ	যখন ১২ ঘণ্টার বেশী আলো পায় ও বয়স বাড়ে। আলোক সংবেদনশীল অবস্থা ৩০ দিনের বেশী হয় এবং আলো বেশী হলেও ফুল হয়।
৩। উগ্র প্রতিক্রিয়া বা স্ট্রংলী সেনসিটিভ	আলোর বৃদ্ধির সাথে বয়সের বৃদ্ধি হয়। মৌলিক জৈবিক অবস্থা সাধারণতঃ ৪০ দিন হয়।

ইহাও সত্য যে কোন্ জাত আলোক সংবেদনশীল ও কোন্‌টা নয় তার কোন নির্ধারিত মাপকাঠি নেই। বেশীর ভাগ ভারতীয় জাতের ধান আলোক সংবেদনশীল যার জন্য এদের বয়স বেশী ও লম্বা হয়, ফলন কম হয়। ধান গাছ পড়ে যাবার সম্ভাবনা বেশী থাকে। আলোক সংবেদনশীল নয় এমন জাত (উচ্চফলনশীল জাত) তাড়াতাড়ি পাকে। তবে দেরী করে লাগালে অনেক সময় খরার প্রকোপে পড়ে বা জল চাপে নষ্ট হয়।

১০. ৮. ১ ধানের বৃদ্ধি ও তাপমাত্রা ঃ ধানের বৃদ্ধি ও ফুল আসার বা পাকার অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রে তাপমাত্রার সাথে একটা সরাসরি সম্বন্ধ আছে। যেমন কোন গাছ যদি বোনা থেকে ফুল আসা পর্যন্ত ১০০ দিন সময় নেয় যখন গড় দৈনিক তাপমাত্রা ২০° সেলসিয়াস তখন ঐ ধানের মোট তাপ লাগবে ২০ × ১০০° = ২০০০° সেলসিয়াস। আবার একই ধান যখন দৈনিক গড় ২৫° সেলসিয়াস-এ লাগান হয় তখন ঐ ধানের ফুল আসতে সময় লাগবে ৮০ দিন (২০০০ ÷ ২৫ = ৮০)।

১০.৮.২ আলোক সংবেদনশীল নয় এমন জাতের ধান গাছে নিম্নলিখিত প্রতিক্রিয়া হয় ঃ

১। তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে পাতার বৃদ্ধি ও পাতা বের হবার গতির বৃদ্ধি হয়।

২। সমতাপমাত্রায় পাতার সংখ্যা মোটামুটি স্থির থাকে।

৩। ঐ একই কারণে গাছের বয়সও মোটামুটি সমান হয়।

৪। তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে দানার পুষ্টিও বেশী হয়।

৫। উচ্চতাপ ফুল আসা ত্বরান্বিত করে এবং নিম্নতাপ ফুল আসা দেরী করে।

১০.৮.৩ ধানের উপর আলোর প্রতিক্রিয়া নিম্নরূপ ঃ

১। ধান একটি অধিক অন্ধকার বা ছোট দিনের ফসল। ছোট দিনের বেশীর ভাগ জাতি বা প্রজাতি যারা ১৪ ঘণ্টা থেকে ১০ ঘণ্টা গড় আলো পায়; কিন্তু এই সংবেদন মাত্রা বিভিন্ন জাতির বা প্রজাতির বিভিন্ন রকম।

২। বয়স্ক পাতা থেকে নতুন পাতা অধিক সংবেদনশীল এবং পত্র আবরণীও কখনও কখনও সংবেদনশীল হয়।

৩। আলোর সংবেদনশীলের প্রভাব একই গাছের এক পাশকাঠি থেকে অন্য পাশকাঠি থেকে প্রতিফলিত হয় না।

৪। আলোর সংবেদনশীলতা মূলতঃ নির্ভর করে কত দীর্ঘ সময় ধরে তারা অন্ধকার পায়। এই অন্ধকার সময়ের মধ্যে ৩—১৫ মিনিট আলো পেলে ফুল বেরোবার সময়ের তারতম্য এনে দেয়।

৫। যেসব জাত অতি তীব্র মাত্রায় আলোক সংবেদনশীল তারা সামান্যতম আলোতে প্রভাবিত হয়। সন্ধ্যার আগে যখন দিনের আলো থাকে ও একটা বা দুটো তারা দেখা যায় এই প্রকার আলো ও দিনের আলো বা ডে লেন্স এদের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

৬। আলোক সংবেদনশীলতা শীষের ভ্রূণ সৃষ্টি ছাড়া, বৃদ্ধি থেকে বেরোন (হেডিং) পর্যন্ত গাছকে প্রভাবিত করে।

৭। মৌলিক জৈবিক বৃদ্ধির অবস্থা বা বি. ভি. পি. সাধরণতঃ ১০—৬০ দিন হয় কিন্তু আলোক সংবেদনশীল অবস্থা বা পি. এস. পি. কিন্তু অনেকদিন পর্যন্ত থাকতে পারে—প্রায় ১২ বছর (ভারগেরা ও চ্যাং ১৯৭৬)।

১০.৯ শীষ ঃ ধান গাছের শীষই হল শেষ কথা। শীষ ভাল না হলে বা বড় শীষ না হলে বা দানা পুষ্ট না হলে ফলন ভাল হবে না।
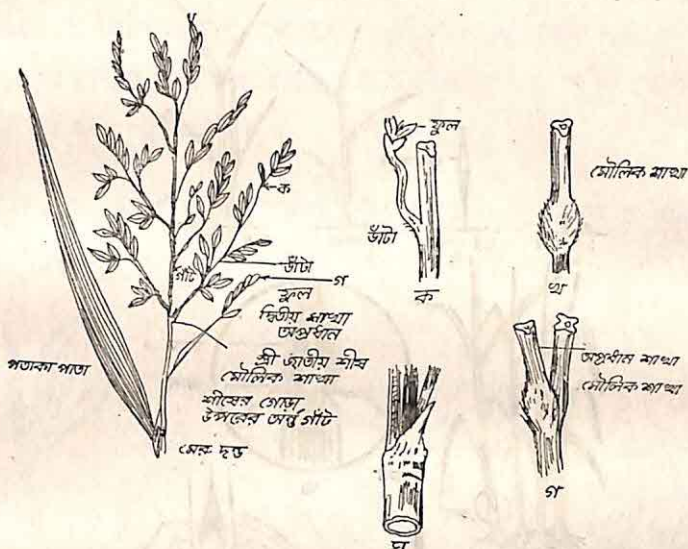
একটি শীষের বিভিন্ন অংশ (চ্যাং ও বারদেনাস-১৯৬৫) ঃ একটি শীষের মেরুদণ্ড ছাড়া বিভিন্ন অংশ হল গোড়া বা বেস, মৌলিক ও অপ্রধান শাখা, ডাঁটা ও ফুল বা স্পাইকলেট। শীষ গোড়া বা বেস থেকে চূড়া বা এপেক্স পর্যন্ত বিস্তৃত। এই শীষের ৮—১০টা গাঁট বা নোড্ থাকে। প্রতি গাঁটের দূরত্ব ২—৪ সেমি পর্যন্ত হয়। এই গাঁট থেকে মৌলিক শাখা ও মৌলিক শাখা থেকে অপ্রধান শাখা বের হয়। মৌলিক ও অপ্রধান শাখা থেকে যে গাঁট তৈরী হয়, সেই গাঁট থেকে বাহির হয় ডাঁটা বা পেডিসেল। এই ডাঁটা ফুল বা স্পাইকলেটকে ধরে রাখে। সাধারণভাবে শীষের গোড়া থেকে একটি মৌলিক শাখা বের হয় কিন্তু অনুকূল পরিবেশে পর্যাপ্ত সূর্যালোক বা উর্বর মাটিতে শীষের গোড়া থেকে একাধিক মৌলিক শাখা বের হয়। এই ধরনের শীষকে স্ত্রী জাতীয় শীষ বলা হয়। এই ধরনের শীষের মেরুদণ্ডের দূরত্ব তুলনামূলক ভাবে কম হয়।

১০.৯.১ শীষের বৃদ্ধি ঃ নীচের ছবি থেকে ক্রমপর্যায়ে শীষের বৃদ্ধির একটি চিত্র দেখান হল ঃ
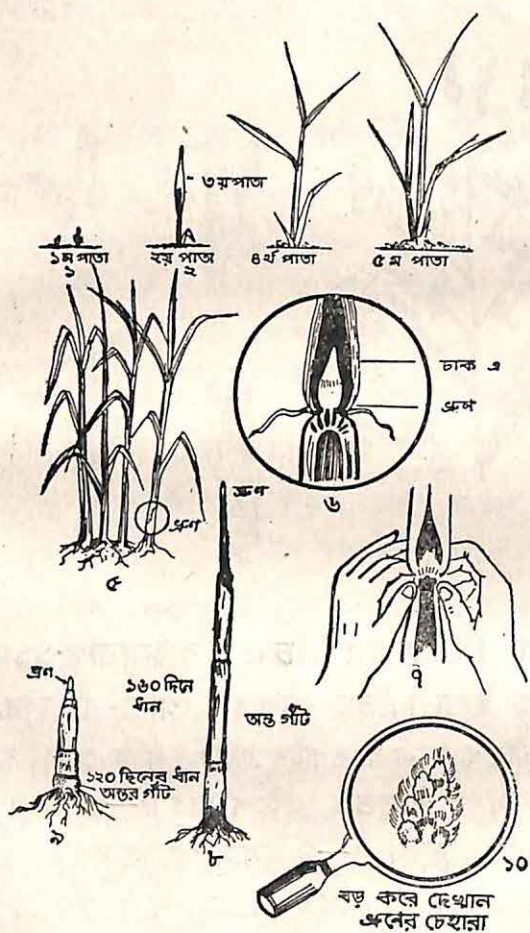
কান্ড বা কান্ডের ভিতরে শীষের ভ্রূণ সৃষ্টি হয় শীষ বের হবার প্রায় ৩০ দিন আগে। এর আর একটা চিহ্ন হল যখন পতাকা পাতার নীচের তৃতীয় পাতা বৃদ্ধি পায়। ভ্রূণের উৎপত্তি থেকে প্রগতি কি করে হয় তা উপরে দেখান হয়েছে। শীষের বৃদ্ধি হতে সময় লাগে প্রায় ২৭—৪৬ দিন। জলদি জাতের ধানের সময় নাবি জাতের থেকে কম লাগে তবে জাত ও আবহাওয়ার উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল। অনুকূল প্রাকৃতিক

পরিবেশে ও আবহাওয়ায় একটি মাঝারি জাতের ধানের (১২৫—১৩০ দিন) এই ভ্রূণ থেকে শীষ হতে সময় লাগে ৩৩ দিন। সাধারণতঃ যেদিন ভ্রূণ খোলা চোখে দেখা যায় সেদিন তার বয়স ৭—১০ দিন। প্রকৃতপক্ষে ভ্রূণ যখন ১ মিমি মাপের হয় তখন খালি চোখে দেখা যায়। এই সময় চাপান সার দেবার কথা বলা হয়। ভ্রূণ দেখা থেকে শীষ বেরোন পর্যন্ত সময় লাগে ২৩—২৫ দিন।

১০.৯.২ ফুল আসা, পরাগমিলন ও বোঁটা (হেডিং ও এনথেসিস্) একটি ফুল বা স্পাইকলেট-এর বিভিন্ন অংশ নীচে দেখান হল ঃ

ফুলের অংশ
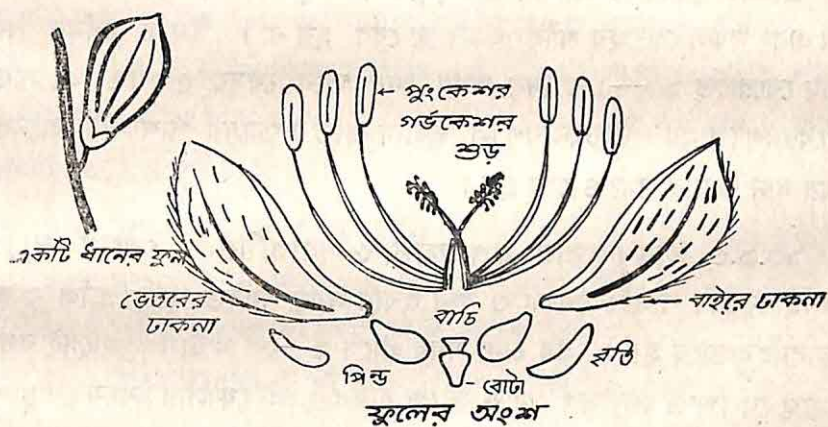
বোঁটা বা পেডিসেল যার উপর ফুল অবস্থান করে। বোঁটার উপর বাটির মতন একটি অংশ যার নাম বাটি বা র‍্যাচিলা। এই র‍্যাচিলা বা বাটির উপর অবস্থান করে ফুলের প্রজনন অংশ, ৬টি পুংকেশর ও ১টি গর্ভকেশর। গর্ভকেশরের ২টি শুঁড় থাকে। গর্ভকেশরের গোড়ায় ২টি পিণ্ড বা লডিকুল থাকে। এই পিণ্ড বা লডিকুল দিয়ে জল ফুলে যায় ও পিণ্ডে আয়তন বেড়ে যাবার জন্য যে চাপ সৃষ্টি করে তাতে ফুলের পাপড়ি (লেমা ও প্যালিয়া) খুলতে সাহায্য করে। এই পাপড়ি প্রজনন অংশ যেমন পুংকেশর ও গর্ভকেশরকে ঢেকে রাখে। বোঁটার দু'পাশে ২টি বৃতি বা গ্লুম পাপড়ি দু'টিকে আটকে রাখে। ফুল বেরোবার ১৮

দিন আগে পতাকা পাতা বা শীর্ষ পাতা বের হয়। এই সময় অন্তঃ-গাঁটের দ্রুত বৃদ্ধি হয় এবং শীষের মধ্যের ভ্রূণের বৃদ্ধি হয়। শীষ বের হবার বা হেডিং এর ৬ দিন আগে পতাকা পাতার আবরণী স্ফীত হয়। এই অবস্থাকে বুটিং অবস্থা বলে। উপর থেকে ২য় অন্তঃগাঁট শীষ বের হবার ২ দিন আগে দ্রুত লম্বা হতে থাকে। এরপরে প্রথম অন্তঃগাঁট দ্রুত বাড়ে এবং শীষকে পাতার আবরণী থেকে ঠেলে বের করে দেয়। ঠাণ্ডা পরিবেশে ফুল বের হতে দেরী হয়। কোন একটি জমিতে কোন প্রজাতির ধানে একসাথে ফুল বের হয় না।

প্রতিটি ধানের চারার গোছের (ক্লাম্প) মূল চারার শীষ আগে বের হয় এবং সকল গোছের শীষ একসাথে বের হয় না। একটি জমির সব শীষ বেরোতে ১০—১৪ দিন সময় নেয় তবে যেসব প্রজাতি আলোক সংবেদনশীল নয় (উচ্চফলনশীল জলদি জাত) তাদের পাশকাঠি অনেক সময় ধান কাটার সময়ও বের হয়।

১০.৯.৩ শীষ বেরোন, ফুল ফোটা ও পরাগমিলন (এনথেসিস্): একটি ফুলের পাপড়ি খোলা ও বন্ধ হবার সময় পর্যন্ত অনেকগুলি কাজ ধারাবাহিকভাবে হয়। এর জন্য সময় লাগে ১—২½ ঘণ্টা। আগেই বলা হয়েছে যে পিণ্ড জলসিক্ত হয় ও ফুলে যায়। এই ফোলার সময় যে চাপ সৃষ্টি হয় তা ফুলের পাপড়িকে মেলে ধরতে সাহায্য করে। ফুল ফোটার সময় পাপড়ির উপরিভাগ ব শীর্ষভাগ ধীরে ধীরে খোলে। ওই সময় পরাগকেশরের দণ্ড বা ফিলামেণ্ট লম্বা হতে থাকে। দণ্ড বৃদ্ধির সাথে সাথে পরাগকোষ (এনথার) পাপড়ির বাহিরে আসে। পাপড়ির মুখ আরও একটু খুললে তখন গর্ভকেশর দেখা যায়। পরাগকোষ পাপড়ির বাইরে সম্পূর্ণ আসবার পর পাপড়ি আবার ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়। সেই অবস্থায় পরাগকোষ বাইরে থেকে যায়। পরাগকোষ বেরোবার সময় বেশ কিছু রেণু গর্ভকেশরের উপরে পড়ে এবং স্বয়ংমিলন হয়। অবশ্য বক্রমিলন বা ক্রম পলিনেশনও হয় কিন্তু স্বয়ংমিলন প্রথমে হয় বলে বক্রমিলন খুব কম হয় (শতকরা ১ ভাগেরও কম বক্রমিলন হয়)।

সাধারণতঃ এই ফুল ফোটা বা স্বয়ংমিলন দেশী ও উচ্চফলনশীল ধানের বেলায় সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত হয়। শীতকালে সকালে বেশী ঠাণ্ডা পড়লে সময় পিছিয়ে যায় অর্থাৎ বেলা বাড়লে শীত কমে যায়। এই মিলন বেলা ১টার পরিবর্তে বিকাল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ফুল ফোটা থেকে প্রায় ৫—৬ ঘণ্টা যায় সম্পূর্ণ মিলনকার্য শেষ হতে। গর্ভ সঞ্চারিত ডিম্বকোষ ধীরে ধীরে বাদামী চাল বা ব্রাউন রাইসে পরিণত হয়। ধান-এর দানার আর এক নাম ব্রাউন রাইস।

১০.১০ **ধান পাকা ঃ** দানার মাপের বৃদ্ধি, ওজনের বৃদ্ধি, রং-এর পরিবর্তন ও পাতার রং-এর পরিবর্তন—এদের উপর ধান পাকা নির্ভর করে। ধান পাকার প্রথম অবস্থায় দানার রং সবুজ থাকে ও ধীরে ধীরে হলুদ রং নেয়। দানার ভেতরে প্রথমে দুধ অবস্থা থাকে ও ধীরে ধীরে দুধের ঘনত্ব বৃদ্ধি পায় ও পরে শক্ত ও কঠিন হয়। এই বিভিন্ন অবস্থা চারটি স্তরে অবস্থান করে।

১। দুগ্ধ অবস্থা বা মিল্ক স্টেজ
২। সামান্য শক্ত অবস্থা বা সফ্ট ডাফ্ স্টেজ
৩। কঠিন অবস্থা বা হার্ড ডাফ্ স্টেজ
৪। হলুদ অবস্থা বা ইয়েলো রাইপ স্টেজ

ফুল আসার সময় প্রচুর পরিমাণে মাড় বা স্টার্চ ও শর্করা জাতীয় খাদ্য ধান গাছের কাণ্ড ও পত্র আবরণীতে জমা থাকে। এই সঞ্চিত মাড় শর্করা জাতীয় খাদ্য কাণ্ড ও পত্র আবরণী থেকে দানায় সঞ্চারিত হয়। এই কারণে নীচের দিকের পাতার রং প্রথমে হলুদ হয় (সেনেসেনস্)। এইভাবে পাতার রং নীচের পাতা থেকে শীর্ষ পাতা বা পতাকা পাতা পর্যন্ত হলুদ হয়ে যায়। দানার পুষ্টির ধারণা করা যায়, দানার মধ্যের শক্ত অংশের পরিমাণ থেকে। দুধ অবস্থায় দানার ভিতরে প্রায় ৫৮% জলীয় অংশ থাকে ও সম্পূর্ণ পাকা অবস্থায় ২০% জলীয় অংশ থাকে। এই দানা পাকা ও পুষ্ট হওয়া গড় তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল। ঠাণ্ডার সময় পাকতে বেশী সময় নেয় ও গরমে তাড়াতাড়ি

পাকে। ২৮ সেলসিয়াস গড় তাপমাত্রায় প্রায় ১৩ দিনে ধান পেকে যায় যখন ১৬° সেলসিয়াস গড় তাপমাত্রায় একই জাত ৩২—৩৩ দিন সময় নেয়।

১০.১১ ফলনের মাপকাঠি—সাধারণতঃ ফলনের মাপ বা ওজন চাল দিয়ে হয় না। ধানের মাপে হয়। ধানকে রাফ্ রাইস ও চাল বা দানাকে ব্রাউন রাইস বলা হয়। ওই সময় ধানের ১৪% জল থাকে। ধানের আনুপাতিক ওজন সমপরিমাণ চালের ১˙২৫ ভাগ হয়। সাধারণভাবে দেশী ধান ও ধানের খড়ের হার ১˙০ ঃ ১˙৫ হয় অর্থাৎ এক কুইণ্টাল ধান হলে ½ কুইণ্টাল খড় হয়। উচ্চফলনশীল ধানের হার ১ ঃ ১ অর্থাৎ সমপরিমাণে ধান ও খড় হয়। ধানের বিভিন্ন অংশের সাহায্যে ধানের ফলন নির্ধারণ করা হয়।

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) = প্রতি বর্গমিটার শীষের সংখ্যা × প্রতি শীষে গড় দানার সংখ্যা × % পুষ্ট দানা × ১০০০ দানার ওজন (গ্রামে) × ১০ ^{৫}।

একটি পরীক্ষিত ফলনের হার দেখান হল ঃ

ফলনের অংশ	বর্ষাকালীন	শীতকালীন
১। প্রতি বর্গমিটার শীষের সংখ্যা	২৫০	৩৭৫
২। প্রতি শীষে দানার সংখ্যা	১০০	১০০
৩। প্রতি বর্গমিটারে দানার সংখ্যা	২৫০০০	৩৭৫০০
৪। পুষ্ট দানার সংখ্যা (%)	৮৫	৮৫
৫। ১০০০ দানার ওজন (গ্রাম)	২৯	২৯
৬। আনুমানিক ফলন (টন/হেক্টর)	৬˙১৬	৯˙২৪

(চেণ্ডলার ১৯৬১)

১১ কর্ষণ পরিচালনা (কালচারাল ম্যনেজমেন্ট) ঃ

১১.১ ধান চাষের শ্রেণীবিভাগ ঃ

জলের উৎসের উপর নির্ভর করে ধান চাষকে দু' ভাগে বিভক্ত করা যায়।

● সেচযুক্ত এলাকা। ● অসেচ এলাকা।

১১.১.১ আবার সেচের ব্যবহার ঐ জমির উপর নির্ভর করে জমিকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন—

- উঁচু জমি যেখানে শুকনো চাষ করা হয়।
- নীচু জমি যেখানে কাদায় চাষ করা হয়।
- নীচু জমি যেখানে বোনা চাষ করা হয়।

১১.১.২ জলের অবস্থা অনুযায়ী ঃ

- উঁচু জমি যেখানে জমিতে জল দাঁড়ায় না।
- নীচু জমি যেখানে ৫—৫০ সেমি. পর্যন্ত জল দাঁড়ায়।
- ডোবা জমি যেখানে ৫১ সেমি—৫ মিটার পর্যন্ত জল দাঁড়ায়।
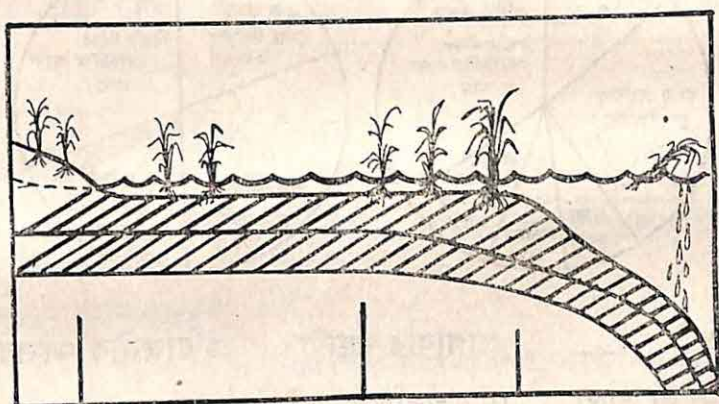
১১.১.৩ ধানের প্রজাতির উপর নির্ভর করে আবার শ্রেণী-বিন্যাস করা হয়।

- ডাঙ্গা জমি—যেখানে ১৩০—১৫০ সেমি লম্বা জাতের ধান চাষ হয়।
- নীচু জমি—যেখানে বেঁটে থেকে লম্বা জাতের (১০০—২০০ সেমি) চাষ হয়।
- অতি নীচু জমি—যেখানে মাঝারি থেকে লম্বা জাতের (১২০—১৫০ সেমি) ও লম্বা জাতের (২০০—৩০০ সেমি) ধানের চাষ হয়।

● ডোবা জমি—যেখানে ১৫০ সেমি থেকে ৫—৬ মিটার পর্যন্ত ও জল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধানের বৃদ্ধি হয় এমন জাতের ধান চাষ হয়।

সাধারণতঃ ধান চাষ সর্বদা বর্ষাকালীন ফসল হিসাবে গণ্য করা হয়।

১১.১.৪ বারকার ও হার্ট, ১৯৭৬-এ নিম্নলিখিত শ্রেণীতে ভাগ করেন—
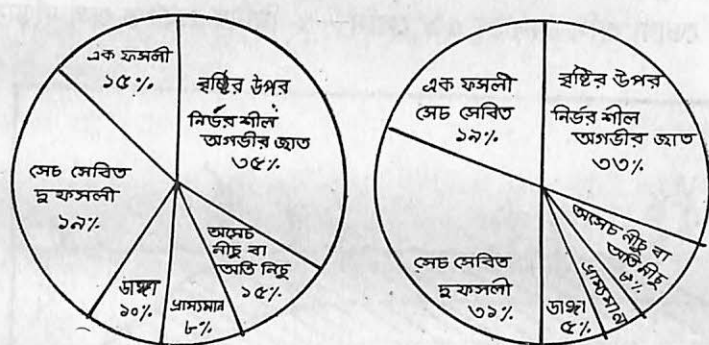
শ্রেণী	লাগাবার পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় জলের মাপ
ক। উঁচু বা ডাঙ্গা	বোনা-ছিটিয়ে, লাইনে বা খুঁপ করে	জমিতে জল দাঁড়াবে না
খ। বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল		
নীচু জমি		
১। সামান্য বৃষ্টি	রোয়া লাগান	০—৫.০ সেমি
২। মাঝারি বৃষ্টি	”	৫.১—১৫.০ ”
৩। অতি বৃষ্টি	”	১৫.১—৫০.০ ”
গ। অতিনীচু জমি ও অতিবৃষ্টি	শুকনো অবস্থায় বোনা	৫০.১—১০০.০ ”

শ্রেণী	লাগাবার পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় জলের মাপ
ঘ। অতি নীচু জমি	শুকনোতে বোনা ও বৃষ্টির জলের বৃদ্ধির সাথে গাছের বৃদ্ধি হয়	১০০'১—৬ মিটার

ধান লাগাবার সময় অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণী নীচে দেখান হল ঃ
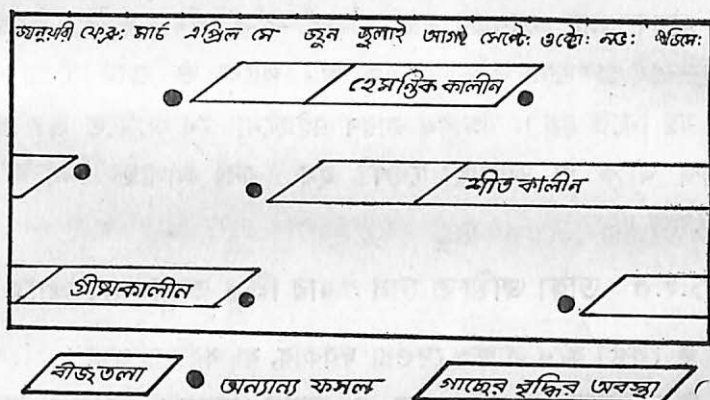
১১.২ জমি তৈরী ঃ

১১.২.১ ডাঙ্গা বা উঁচু জমিতে চাষ করা প্রয়োজনীয় কেন ? ঃ

- প্রথম চাষ করলে প্রাথমিক বৃষ্টির সম্পূর্ণ সুযোগ নেওয়া যায়।
- প্রাথমিক জমি তৈরী, বীজতলা প্রস্তুত বা মূল জমিতে ভাল চাষ করা সম্ভব হয়।
- দ্বিতীয় ও তৃতীয় চাষে সহায়ক হয়।
- সেচবিহীন ফসলের শিকড় বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।
- রোগ বা পোকার বংশবৃদ্ধি ও পরিপূরক জীবনচক্র বিঘ্নিত হয়।
- আগাছা দমনে সহায়ক হয়।

এই কারণে ৭-৮ বার লাঙ্গল দিয়ে চাষ করতে হবে। শেষ চাষের

আগে প্রয়োজনীয় কমপোস্ট সার বা জৈব সার প্রয়োগ করা উচিত। আগের ফসলের অবশিষ্ট গোড়া পরিষ্কার করে ফেলা দরকার। শেষ চাষ দিয়ে ভাল করে মই দিতে হবে যাতে জমি সমতল হয়। যেকোন প্রকারের বোনা ধানের জন্য পূর্বোক্ত ব্যবস্থা প্রয়োজন। মই দিলে জমির অভ্যন্তরের জল সংরক্ষণে ও ভূমি সংরক্ষণের কাজ ভাল হয়।

১১.২.২ নীচু জমি বা ডোবা অঞ্চলে যেখানে বোনা ধান ছাড়া আর কিছু সম্ভব নয়, যেখানে মার্চ/এপ্রিল মাসে জমি চাষ দিয়ে তৈরী করা দরকার—এই প্রকারের জমি অনেক শক্ত থাকে ও জমি তৈরী করতে বিশেষ যত্ন নিতে হয়। আরও কারণ এইজন্যে যে জমিতে জলীয় অংশ খুব কম থাকে ও আগাছা বেশী হয় এবং আগাছা নির্মূল করাও ব্যায়সাপেক্ষ।

১১.২.৩ ডাঙ্গা জমিতে চাষ করার কিছু অসুবিধাও আছে ঃ

- বেশী করে লাঙ্গল দেওয়া দরকার, যা খরচসাপেক্ষ।
- সময়মত আগাছা দূর না করলে আগাছা নির্মূল করা কোন প্রকার সম্ভব হয় না।
- শুকনো চাষ করার জন্য মাটির নীচের জলের ভাগ কমে যায়। যার জন্য ফসল লাগাবার পর জলসংকট দেখা দেয়।
- সারের চাহিদা অনেক সময় বেশী হয়।

উপকারিতা ঃ

- মাটির গঠন ভাল করে ঝুরঝুরে হবে যাতে মাটির ভেতরে হাওয়া বা অক্সিজেন প্রবেশ করতে পায়।
- ডাঙ্গায় চাষে মাটির ক্যাপিলারী ব্যবস্থা ভেঙ্গে যায়। ফলে মাটির জল বাষ্পীভবন হয়ে বেরিয়ে যেতে পারে না।
- মাটির তাপমাত্রা বীজ অঙ্কুরিত হতে সাহায্য করে।
- হালকা মাটিতে ভারী যন্ত্র ব্যবহার করলে মাটি শক্ত বা কমপ্যাকট হয়।

১১.২.৪ **কাদায় চাষ ঃ** ধানের উৎপাদন নির্দিষ্ট মানে পেঁছাতে অনেকগুলি উপাদান আবশ্যক যা সরাসরি উৎপাদনের সহায়ক। ঐ উৎপাদকগুলি যেমন, উৎকর্ষ বৃদ্ধি ও পরিচর্যা, সারের সময়োপযোগী ব্যবহার, জলের ব্যবহার ও শস্যরক্ষা ছাড়া বীজ বপনের আগে বা চারা লাগাবার আগে জমি তৈরী করা পরোক্ষভাবে উৎপাদনের সহায়ক। সময়োপযোগী এবং উৎকৃষ্ট ভাবে জমি তৈরী গাছের বৃদ্ধির সহায়ক। অসময়ে বা নিম্নমানের জমি তৈরী হলে আগাছা বেশী হয় এবং অপরিপক্ব বা অপরিণত জৈব পদার্থের দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতিকারক গ্যাস যেমন কার্বন ডাই-অক্সাইড্, মিথেন, মারকাপটান, বিউট্রিক অ্যাসিড ইত্যাদি গাছের জৈবিক বৃদ্ধিতে ব্যাহত করে।

পানেমপেরুমা ১৯৬৭ ঃ পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৮০% জমিতে কাদায় ধান লাগান হয়।

কাদা করার উদ্দেশ্য কি ? ঃ

- আগাছাকে ভালভাবে দমন করা, জমি তৈরীর সময় আগাছা নির্মূল হয় এবং ধানের চারার সাথে খাদ্যের ভাগ গ্রহণ করতে পারে না (স্টাউট ১৯৬৬)।
- আগের ফসলের অবশিষ্ট জৈবাংশকে উত্তমরূপে মাটিতে মিশিয়ে গাছের খাদ্যে রূপান্তরিত করে।
- মাটিকে নরম কাদায় পরিণত করে এবং চারা লাগাবার উপযুক্ত করে দেয় (দত্ত ও বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৬৬)।
- কাদার নীচে একটি শক্ত স্তর তৈরী করে যার জন্য পরবর্তী জল জমিতে প্রবেশ করলে মাটির নীচে চলে যেতে দেয় না।

কখন করা দরকার ? ঃ

- আগেকার ফসল কাটার পর শুকনো জমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রথম চাষ দেওয়া উচিত।

- জমিতে যদি পূর্ববর্তী রবি ফসল কাটার পর সময় থাকে তাহলে মার্চ-এপ্রিল বা চৈত্র মাসে জমিতে লাঙ্গল দিয়ে চাষ দেওয়া উচিত।

- ধান লাগাবার অন্ততঃ ১৫ দিন আগে জমি কাদা করে জল দিয়ে রাখা উচিত। পোনামপেরুমা (১৯৬৫)-র মতে যেসব বিষাক্ত গ্যাস জমির অপরিপক্ব জৈবাংশ থেকে তৈরী হয় সেগুলি সাধারণতঃ জমিতে জল ঢোকার ২০—২২ দিন পর্যন্ত থাকে; তারপরে ধীরে ধীরে কমে যায়। এই কারণে জমি আগে তৈরী করে নিলে ধানের চারা লাগাবার পর বিষাক্ত গ্যাসের প্রভাব চারার উপর পড়ে না ও অ্যামোনিয়া যা এই জৈবাংশ থেকে তৈরী হয় তা চারা সহজে গ্রহণ করতে পারে।

কাদার চাষকে তিন স্তরে করা হয়ঃ

- প্রথমে জমিতে পর্যাপ্ত জল দেওয়া হয়, যাতে জমির উপরে ৭.৫—১০.০ সেমি জল দাঁড়িয়ে থাকে।

- লাঙ্গলের সাহায্যে চাষ দিয়ে জমির মাটি ভেঙ্গে দেওয়া হয়, যাতে পুরাণ ফাটলের মধ্যে দিয়ে পর্যাপ্ত জল জমির ভেতরে ঢুকতে পারে ও মাটিকে নরম করে দেয়।

- পরে লাঙ্গল দিয়ে মাটি ভাল করে কাদায় পরিণত করা হয়।

জলের মোট চাহিদার ১/৩ অংশ জমি তৈরী বা কাদা করার জন্য লাগে। যেসব জমিতে কাদা মাটির অংশ ২০% উপরে সেই সব জমিতে কাদা করা সম্ভব। ভাল কাদা তৈরী হলে জমিতে জল দাঁড়িয়ে থাকে ও মাটির নিচের স্তরে চুঁইয়ে যেতে পারে না। জমির অভ্যন্তরের খালি অংশে জল ঢুকে গিয়ে চুঁইয়ে যাবার রাস্তা বন্ধ করে দেয়।

একটা ভাল কাদা করার জমির গুণ কি?ঃ

- আগাছা খড় বা গোবর সার ইত্যাদি যা কাদা করার আগে জমিতে ছিল তা ভাল করে পচে মাটির সঙ্গে মিশে যাবে।

- মাটি ও জল ভাল করে মিশে গিয়ে জমি সমতল হবে এবং জমির জল সমান মাত্রায় জমির সর্বত্র বিরাজ করবে।

কাদা মাটিতে নাইট্রোজেনের অবস্থা
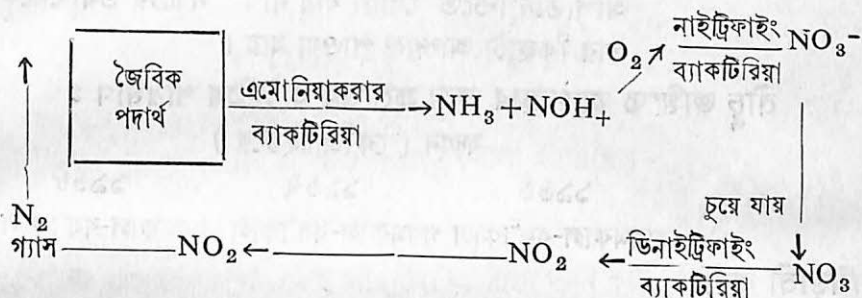
(উৎস ঃ রাইস প্রোডাকসন ম্যানুয়াল ১৯৭০ পৃ. ৭৬)

কাদা করা জমির উপকারিতা ঃ

- প্রথমে কাদা করার পর ১০—১৫ দিন জমিতে জল বেধে রাখা হয়, পরে ২য় ও ৩য় বার চাষ করার পর যে কাদা তৈরী হয় তাতে আগাছা সম্পূর্ণ নির্মূল হয়।
- চারা লাগাতে সুবিধা হয়।
- কাদা করা জমিতে অক্সিজেনের অভাব হওয়ার জন্য উর্বরতা বাড়ে ও সারের সুষম ব্যবহার হয়।
- কাদা জমি তৈরী করতে খরচ কম।
- জল জমিতে অনেকদিন পর্যন্ত ধরে রাখা যায়।
- নিড়ানী খরচ কম।

কাদা জমির অপকারিতা ঃ

- মাটির গঠনের পরিবর্তন করে যা আবার রূপান্তরিত করতে অসুবিধা হয়।
- শিকড়ের গঠন ও বৃদ্ধিতে অসুবিধা সৃষ্টি করে।
- জীবাণুর বংশবৃদ্ধি ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অসুবিধা হয় যেহেতু অক্সিজেন থাকে না বা কম থাকে।

১১.৩ আগাছা ও তাদের দমন :

১১.৩.১. ● **কেন দমন করা দরকার :** ধান উৎপাদনে ও ফলনের উপর আগাছার প্রভাব সব থেকে বেশী কিন্তু আপাতঃদৃষ্টিতে বোঝা যায় না। নীচের তথ্য থেকে তার কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যায়।

নীচু জমিতে আগাছার জন্য ফলনের ঘাটতির পরিমাণ :

ফলন (কেজি/হেক্টরে)

	১৯৬৬		১৯৬৭		১৯৬৮	
	গরমকাল	বর্ষাকাল	গরমকাল	বর্ষাকাল	গরমকাল	বর্ষাকাল
নিড়ানী করা ক্ষেত—	৬১১৪	৪৩৩৬	৬১৮১	৩৭৭৬	৭৪৬০	৫৭৮৭
আগাছাযুক্ত ক্ষেত—	২৯৫০	২৮৭৬	৫১১৫	৮৯৯	২৯৯৪	২১৩৩
% ফলনের ঘাটতি—	৫১.৭	৩৩.৬	১৭.২	৭৬.২	৫৯.৪	৬৩১

উৎস : রাইস প্রোডাকসান ম্যানুয়াল, ১৯৭৬ পৃঃ ১৪৭।

উপরের তথ্য থেকে বোঝা যায় যে শতকরা ৭৬ ভাগ পর্যন্ত ফলন কম হয় কেবল আগাছা থেকে।

আগাছা কিভাবে ক্ষতি করে ? :

● সরাসরি ধান গাছের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, সূর্যকিরণ এবং জায়গার অংশ নিজেরা ভোগ দখল করে উৎপাদন ব্যাহত করে।

● পরোক্ষভাবে কীট ও রোগের আক্রমণ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

● সেচ ও নিকাশী ব্যবস্থায় বাধা সৃষ্টি করে।

১১.৩.২ কোন, কোন, প্রকারের আগাছা ধানের ক্ষতি করে ? :

ধানের জমিতে তিন প্রকারের আগাছা পাওয়া যায়। আগাছা আবার ডাঙ্গা জমি ও জলা জমিতে ভিন্ন প্রকারের হয়। :

ডাঙ্গা জমিতে :

এক বীজপত্রী—দূর্বা জাতীয়

দ্বি-বীজপত্রী—শিয়ালকাঁটা জাতীয়।

নীচু জমিতে ঃ

এক-বীজপত্রী—জাওয়া ঘাস
দ্বি-বীজপত্রী—স্পেনোক্লিয়া জিলেনিকা ইত্যাদি।

আবার,

ঘাস যেমন—দূর্বা ঘাস ইত্যাদি
সেজ্ „ —মোথা ঘাস ইত্যাদি
চওড়া পাতা—কচুরীপানা ইত্যাদি।

১১.৩.৩ আগাছা দমন ঃ

- রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে আগাছা দমন করা যায়। রাসায়নিক পদার্থের গ্বণ ও ব্যবহার পদ্ধতির উপর নির্ভর করে ওষ্বধ ব্যবহার করা হয়। যেমন—

ক। জমি তৈরী করার পর কিন্তু বীজ বপনের বা লাগানর আগে যখন আগাছানাশক ওষ্বধ ব্যবহার করা হয়। যেমন—প্যারাকুয়াড্।

খ। জমি তৈরী করার পর এবং বীজ বপন বা লাগানর পর ওষ্বধ প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু তখনও চারা গাছ বের হয় না। যেমন—টৌক-ই-২০ বা এপটাম-এম।

গ। চারা ও আগাছা বের হবার পর আগাছা মারবার জন্য যে ওষ্বধ প্রয়োগ করা হয়। যেমন—মোলিনেট।

- নিড়ানী যন্ত্রের সাহায্যেও একাধিকবার নিড়ানী দিয়ে আগাছা নিম্র্ল করা যায়।
- হাত নিড়ানী, খ্বরপী বা হাত কোদাল দিয়ে ডাঙ্গা বা কাদা জমিকে আগাছা ম্বক্ত করা যায়।
- ডাঙ্গা জমির জন্য হ্বইল হো ও কাদা জমির জন্য প্যাডি উইডারের সাহায্যে আগাছা নিম্র্ল করা যায়।

১১.৪ **ফসল আগাছার প্রতিযোগিতা ঃ** এক জমিতে ফসল ও আগাছা নিজেদের জীবনচক্র সম্পূর্ণ করবার জন্য একই জায়গা থেকে উপস্থিত খাদ্য, জল, স্থান, আলো ইত্যাদি গ্রহণের জন্য প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। এই প্রতিযোগিতা শুরু হয় যখন ফসল ও আগাছা খুব কাছাকাছি বাড়তে থাকে। এই প্রতিযোগিতার ফল হয় ফলনের ঘাটতি। এই প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পায় যখন ফসল ও আগাছা একই গোষ্ঠীভুক্ত হয় ; বিশেষ করে শিকড়ের বৃদ্ধি বা পাতার বৃদ্ধি একই রকমের হয়। তাছাড়া ফসল ও আগাছা অনেক সময় বিপরীতধর্মী হয় এবং ক্ষতিকারক পরিবেশ সৃষ্টি করে থাকে।

● আগাছার প্রতিযোগিতা বর্তমানে উচ্চফলনশীল জাতের প্রবর্তনে আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। যেহেতু উচ্চফলনশীল ধান বেঁটে ও পাতা সোজা থাকে সেই কারণে বাতাস বা সূর্যের আলো মাটি পর্যন্ত যায়। ফলে আগাছাও এই সুবিধা পায় ও জমিতে প্রচুর পরিমাণে আগাছা দেখা দেয়। তাছাড়াও উচ্চফলনশীল ধান বেশী খাদ্যগ্রহণ করে বলে জমিতে বেশী পরিমাণে সার প্রয়োগ করা হয়। এই সারও আগাছা সম-পরিমাণে ভোগ করে থাকে। যখন ধান ও আগাছা একসাথে জন্মায় তখন কি হারে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে তার তথ্য নীচে দেখান হল ঃ

	নাইট্রোজেন গ্রহনের মাপ (কেজি/হেক্টর)	
গাছের জাত	আগাছা ও ধান একসাথে	ধান ও ২-৩টা আগাছা
ধান	২৬	১০৬
ইকনোক্লোয়া	৭৫	০·৬
মোট	১০১	১০৭

উৎস ঃ মুডী ১৯৭৭-এ

● ধান ঘন করে লাগালে আগাছার বৃদ্ধি কম হয় ও জন্মায় কম। নীচের তথ্যে তার প্রমাণ পাওয়া যায় ঃ

চারা লাগানর দূরত্ব (সেমি)	কেজি/হেক্টরে আগাছার ওজন আই. আর. ২৮	আই. আর. ৩০
১৫×১৫	১৯৮৪	২৪৫৮
২০×২০	৩২৯৬	৩০৭৬
২৫×২৫	৩৪৭০	৩৮১৮

(উৎস ঃ এসটরনিনস্ ও মুডি ১৯৭৬)

১১.৫ সেচব্যবস্থা ঃ ধান উৎপাদনে জল হল সব থেকে প্রয়োজনীয় ও জরুরী উপাদান। জল ধানের গঠনতন্ত্র, মাটির অভ্যন্তরে খাদ্যের স্থিতিশীলতা ও আগাছার ঘনত্বকে নিয়ন্ত্রিত করে। এইসব উপাদান আবার ফলনকে প্রভাবিত করে, গবেষণালব্ধ তথ্য থেকে জানা যায় যে নিয়ন্ত্রিত জল বা সেচব্যবস্থা ধানের সম্ভাব্য ফলন দিতে সাহায্য করে। ধান গাছের বিভিন্ন অবস্থায় জলের প্রয়োজন।

১১.৫.১ সাধারণভাবে ধানের ভাল ফলন পেতে গেলে গড়ে মাসে ১৮০-৩০০ মিমি জলের প্রয়োজন হয়। প্রথম এই ১৮০-৩০০ মিমি জল রাখতে গেলে জমিতে জলের অভাব ও যোগানের সুযোগ সম্বন্ধে কিছু জানা দরকার। দেখা যায় যে, জমি তৈরীর জন্য জলের স্থায়ী চাহিদা ৭˙৫ সেমি, অনুরূপভাবে বীজতলার জন্য ৭˙৫ সেমি, চারা লাগানর জন্য ২˙৫ সেমি, পাশকাঠি ছাড়ার জন্য ৫˙০ সেমি, বংশবৃদ্ধির জন্য ৫˙০ সেমি ও পাকার জন্য ২˙৫ সেমি জল সব সময় থাকা প্রয়োজন। কিন্তু এই অবস্থা কোন সময় থাকে না তার কারণ জলের অপচয়।

১১.৫.২ অপচয় কিভাবে ও কতটা হয় ? ঃ

অবস্থা ও পরিবেশের তারতম্যে জলের অপচয় ঘটে।

- বাষ্পীমোচন এর দ্বারা দৈনিক ১˙৫-১˙৮ মিমি
- বাষ্পীভবন " " " ১˙০-৬˙২ " "
- চুঁইয়ে যাওয়া " " " ০˙২-১৫˙৬ " "

মোট " ৫˙৬-২০˙৪ " "

অতএব এই ক্ষতি নিয়মিত ও দৈনিক পূরণ করা সম্ভব নয়। সেই কারণে প্রয়োজনীয় জল সরবরাহ করে এই অভাব পূরণ করা দরকার। যেখানে বৃষ্টির উপর নির্ভর করে ধান লাগান হয়, সেখানে এই ক্ষতি মোট চাহিদার উপর কোন প্রভাব ফেলে না। কিন্তু যেখানে সেচ ছাড়া চাষ সম্ভব নয় সেখানে এই নষ্ট হয়ে যাওয়া জলের সাহায্যে সেচ দিয়ে প্রয়োজনবোধে প্রতি সপ্তাহে বা ১০ দিন অন্তর জলের চাহিদা মেটাতে হয়।

১১.৫.৩ গাছের জলের প্রয়োজন কেন ? ঃ গাছ জীবনধারণের জন্য মাটির অভ্যন্তরে অবস্থিত জল শিকড়ের সাহায্যে গ্রহণ করে এবং যতটা গ্রহণ করে তার শতকরা মাত্র ৫% শরীর গঠনে ব্যয় করে। বাকী ৯৫% পাতার মাধ্যমে বাষ্পীমোচন করে। এই ৫% ভাগের ভূমিকা কি ?

ক্রামারের (১৯৬৯) বিশ্লেষণ এইরূপ ঃ—

- জীবকোষের প্রোটোপ্লাজমের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
- রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যম।
- ইহার মাধ্যমে জৈব রাসায়নিক ও গ্যাসীয় পদার্থ ঘূর্ণনশীল হয়ে খাদ্য হিসাবে পাতায় ও অন্যান্য অংশে সঞ্চারিত হয়।
- ইহা গাছের মেকানিকাল বা যান্ত্রিক শক্তি সংগ্রহে সাহায্য করে।

এই কারণে জলের চাহিদার দিকে নজর দিতে হয়।

১১.৫.৪ জল সরবরাহ সঠিক না হলে কি হয় ? ঃ

কম জলে—

- ডাঙ্গা জমিতে মাটির তাপমাত্রা শীতকালে বেশী ঠাণ্ডা হয় এবং

গ্রীষ্ম ও বর্ষা কালে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। বেশী ঠাণ্ডায় নাইট্রোজেন সরবরাহ কমে যায়। গাছের বৃদ্ধি স্তব্ধ হয়ে যায়। তাপমাত্রার বৃদ্ধিতে চারা গাছ মরে যায়, পাশকাঠি বেরোয় না ; এবং অনেক সময় তাড়াতাড়ি ফুল এসে যায়।

- ডাঙ্গা ও কাদা জমিতে আগাছা বৃদ্ধি পায় ও অনেক সময় আগাছা ধান্‌গাছ মেরে ফেলে।
- কাদা চাষে কম জলে পাশকাঠি বাড়তে দেয় না।
- শীষ বের হবার ২০ দিন আগে থেকে—শীষ বের হবার ১০ দিন পর্যন্ত জল কম হলে গাছের সব থেকে বেশী ক্ষতি হয়।

বেশী জলে—

- কম তাপমাত্রা থাকলেও গাছের ক্ষতি করতে পারে না। খাদ্যের ঘাটতি দেখা দেয় না। কোন কোন ক্ষেত্রে যেমন লোহা ও ম্যাঙ্গানীজের সরবরাহ বেশী হয় ও ক্ষতিকারক স্তরে এসে যায়। এই ঘটনা নিকাশী ব্যবস্থা না থাকলে বেশী হয়।
- গাছের অন্তগাঁটের বৃদ্ধি হয়। কাণ্ড লম্বা হয়ে যায়—যার জন্য গাছ সহজে পড়ে যায়। ফলন্ত গাছ বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
- আগাছা কম হয়।
- পাশকাঠি কম বের হয়।

১১.৬ ভাল পরিচালনার গুণ ঃ

১১.৬.১ ডাঙ্গা জমি ঃ পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ১০% ধান ডাঙ্গা জমিতে হয়। সাধারণতঃ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের এই ধরনের জমি বেশী। এইসব জমির সমস্যা ঃ

- বৃষ্টির জলের অপ্রতুলতা ও অনিশ্চয়তা।
- সেচের উৎস কম।
- যেহেতু এইসব জমিতে জলীয় অংশ সম্পূর্ণভাবে বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল সেই কারণে গাছ খাদ্য ঠিকমত পায় না বা গাছের বৃদ্ধি হয় না। অক্সিজেনের প্রাচুর্য মাটিতে ফসফরাসের অভাব

এবং নিরপেক্ষ ও অম্ল মাটিতে লোহার অভাব পরিলক্ষিত হয়। এই রকম অম্ল জমিতে এমোনিয়াম সালফেট প্রয়োগ করলে ম্যাঙ্গানীজ ও এ্যালুমিনিয়ামের আধিক্য এমন কি ক্ষতিকারক পর্যায়ে দেখা দেয়।

- আগাছার প্রতিযোগিতা বেশী হয় ও সময়মত আগাছা নির্মূল না করলে ফলন কম হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে। ঝলসা রোগ হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়।

১১.৬.২ **জাত নির্বাচন ঃ** ডাঙ্গা জমিতে দেশী ধানের চাষ বেশী হয়। বিশেষ করে মাঝারি বা লম্বা জাতের ধান লাগান হয়। এইসব জাতের খরা সহনশীলতা দেখা যায় কিন্তু ফলন অত্যন্ত কম। কিন্তু উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগ করে অন্তঃপক্ষে হেক্টর প্রতি ৩—৪ টন ফলন পাওয়া দরকার। এই ফলন পেতে গেলে প্রজাতির নিম্নলিখিত গুণ থাকা দরকার ঃ

- বেঁটে জাতের ধান যার উচ্চতা ১০০—১২৫ সেমি এইরূপ প্রজাতির নির্বাচন করা দরকার।
- মাঝারি থেকে বেশী বিয়ান বা পাশকাঠি ছাড়ার ক্ষমতা থাকা দরকার।
- খরা সহনশীলতা বা খরা সহ্য করে এবং পরে জল বা বৃষ্টি পেলে গাছের বৃদ্ধির উপযোগী ক্ষমতা থাকা চাই।
- গাছ পড়ে যাওয়ার প্রবণতা নেই এই গুণ সম্পন্নজাত।
- ঝলসা সহনশীলতা।
- সময়মত অনুমোদিত সার প্রয়োগ ও পরিচর্যা করা।
- সাধারণভাবে প্রতি বর্গমিটার জমিতে অন্ততঃপক্ষে ৪০০টি ফলনযোগ্য শীষ থাকা দরকার।
- সময়মত রোগ ও পোকার ক্ষতি থেকে রক্ষা করা।
- প্রয়োজনমত ১৫ ও ৩০ দিন পরে যন্ত্র বা হাত নিড়ানীর সাহায্যে গাছের পরিচর্যা করা।

১১.৬.৩ পশ্চিমবঙ্গে নীচু জমিতে ধানের চাষ সব থেকে বেশী হয়। অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে যে প্রায় ৩৪% ধান বৃষ্টির সাহায্যে রোয়া করা হয় ও ৩২% সেচের সাহায্যে রোয়া করা হয়। তাছাড়া প্রায় ১৫% বোনা ধানের ৮% অতি নীচু জমিতে বোনা হয়। সেখানে জলের চাপ প্রায় ৫—৬ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে।

বোনা ধানের কর্ষণ ও পরিচর্যা প্রায় ডাঙ্গা জমির মত হয়। কিন্তু অপেক্ষাকৃত শক্ত মাটিতে (এঁটেল) আভ্যন্তরীণ জলের পরিমাণ খুব কম থাকায় সময়মত চৈত্র-বৈশাখ মাসে জমি তৈরী ও বীজ বোনা সম্ভব হয় না। যেসব অঞ্চলে আগাম বৃষ্টি (জ্যৈষ্ঠ মাসে) হয়, সেখানে বীজ লাগাবার সময় পাওয়া যায় না। সেই সব ক্ষেত্রে জলচাপ সহ্য করতে পারে এই রকম প্রজাতির চারা তৈরী করে রোয়া করলে অনেক সময় ভাল ফলন পাওয়া যায়।

১১.৬.৪ রোয়া ধানের ক্ষেত্রে ঐ পরিচর্যা অনেক যত্ন সহকারে করতে হয়। যেসব জমিতে সম্পূর্ণ বর্ষার জলের উপর নির্ভর করে ধান লাগান হয় তার বীজতলা প্রথম বৃষ্টিতে করা উচিত। বর্ষাকালে মাটির তাপ, সূর্যকিরণ, আর্দ্রতা ইত্যাদি অনুকূল অবস্থায় থাকে এবং সহজেই বীজ অংকুরিত হয়। শীতকালে অর্থাৎ বোরো ধানের বীজতলা তৈরীর সময় বীজ অংকুরিত করতে হলে ২৪ ঘণ্টা ধান ভিজিয়ে পরে ৪৮ ঘণ্টা জাগ দিয়ে নিতে হয়। অংকুরিত বীজ পুষ্ট, সবল ও সমভাবে চারা তৈরী করতে সাহায্য করে।

১১.৬.৫ **বীজতলা তিন প্রকারের হয়ঃ**

- শুকনো বীজতলা।
- কাদায় বীজতলা।
- ড্যাপোগ বীজতলা।
- বীজতলার ভালমন্দ জমি নির্বাচনের উপর নির্ভর করে।

ভাল বীজতলার জন্য জমির নিম্নলিখিত গুণ থাকা দরকারঃ

- সংরক্ষিত খাদ্যের মান ভাল থাকা।
- জমির গঠন ভাল থাকা।

- জমির মান ভাল থাকা।
- সেচোত্তর ও জলনিকাশী ব্যবস্থা।

বীজতলা তৈরী করবার সময় জমিতে ভাল করে চাষ দিতে হবে। প্রয়োজনবোধে গোবর সার বা আর্বজনা সার দিতে হবে। জমি ভুরভুরে করে নিতে হবে। কাদা জমির আগাছা ভাল করে পচাতে হবে। মাটি ভালভাবে কাদা করা চাই। জমি তৈরী হলে ১ মিটার চওড়া ১৫ সেমি উঁচু করে বীজতলা তৈরী করতে হবে। একটা বীজতলার চারধারে জলনিকাশী নালা তৈরী করতে হবে।
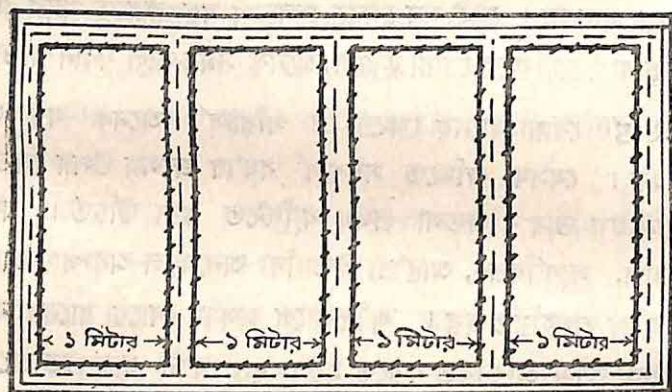
বীজের হার শুকনো ও কাদা উভয়ের জন্য প্রতি বর্গমিটার জমিতে ন্যূনপক্ষে ৮০% অঙ্কুরোদগম ক্ষমতাযুক্ত পুষ্ট বীজ ১০০ গ্রাম করে ছড়াতে হবে। কিন্তু ড্যাপোগ পদ্ধতির জন্য সমপরিমাণ জমিতে ১০০০ গ্রাম বীজ লাগবে।

কাদায় বীজতলা—বর্ষাকালে বীজ ২৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখলেই অঙ্কুরিত হয় কিন্তু শীতকালে ঐ বীজ অঙ্কুরিত হতে ২৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখার পর আরও ৪৮ ঘণ্টা জাগ দিয়ে রাখতে হবে। তবেই বীজ অঙ্কুরিত হবে। অঙ্কুরিত বীজ সমানভাবে বীজতলায় ছিটিয়ে দিতে

হবে। দেখতে হবে বীজ যেন মাটির উপরে থেকে না যায়। কাদায় ছিটান বীজ সাধারণতঃ মাটির ঠিক নীচের ভাগে পড়ে। বীজতলা যেন সবসময় ভিজে থাকে ও নালায় যেন জল থাকে। প্রয়োজনবোধে রোগ ও পোকা থেকে রক্ষা করার জন্য—জমি তৈরীর সময় দানাদার ওষুধ অথবা চারায় যখন ২-৩ পাতা হবে তখন নার্সারী স্প্রে বা ঐ জাতীয় ওষুধ মিশ্রণ প্রয়োগ করা দরকার। চারায় ৪-৫ পাতা হলেই লাগাবার উপযুক্ত হবে। সাধারণতঃ ১৮-২০ দিন পরে চারা লাগাবার উপযুক্ত হয়।

ড্যাপোগ পদ্ধতি কাদার বীজতলার অনুরূপ। কিন্তু বীজতলা তৈরী হবার পর বীজতলায় কলাপাতা বা পলিথিনের চাদর বিছিয়ে দিতে হয়। এমন কি সুব্যবস্থা থাকলে সিমেণ্ট বা কন্‌ক্রিটের সমতল জায়গায়ও এই বীজতলা করা যায়। এই প্রথায় কেবল অংকুরিত বীজ ব্যবহার করা হয়। বীজ ভাল করে ও সমানভাবে বিছিয়ে দিয়ে হালকা করে চেপে দিতে হয়। মাঝে মাঝে জল দিতে হয়, যাতে সবসময় ভিজে থাকে। ৯—১৪ দিনের মধ্যে চারা লাগাবার উপযুক্ত হয়। চারা উঠাতে খরচ নেই ও সহজে মূল জমিতে বহন করা যায়।

এই পদ্ধতির উপকারিতা ঃ

- বীজতলার জন্য জমি কম লাগে। কাদায় যেখানে ১ হেক্টর জমির জন্য ৪০০ বর্গমিটার বীজতলা দরকার সেখানে এই পদ্ধতিতে মাত্র ৪০ বর্গমিটার জমি লাগে।
- চারা তৈরী হতে কম সময় নেয় ও রোগ বা পোকার আক্রমণ কম হয়।
- চারা মূল জমিতে সহজে লেগে যায়।
- খরচ কম।

এই পদ্ধতির অসুবিধা—

- সুপরিকল্পিত ও সুনিয়ন্ত্রিত সেচ-ব্যবস্থা দরকার।
- চারা ছোট হয় বলে মূল জমিতে জল বেশী রাখা চলে না।
- মূল জমি ভাল করে প্রস্তুত না করলে আগাছা সহজে বৃদ্ধি পায়।

ডাঙ্গার বীজতলা : এই বীজতলার মাপ, উচ্চতা সব কাদার বীজতলার অনুরূপ ; কিন্তু জল থাকবে না। কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় রস বা জো থাকবে। বীজতলায় বীজ ছিটানর পর একটু চেপে দিতে হয়। ডাঙ্গা বীজতলার চারা মজবুত হয় ও তাড়াতাড়ি বাড়ে।

১১.৭ চারার বয়স ও চারা ওঠান :

সাধারণতঃ যে কোন বীজতলায় চারা ৪-৫ পাতা হলেই লাগাবার উপযুক্ত হয়। আলোক সংবেদনশীল জাতের চারা ৪০ দিন বয়স পর্যন্ত লাগান যায়। কিন্তু ২১-২২ দিনের চারাই উৎকৃষ্ট। আলোক সংবেদনশীল নয় এমন জাত যেমন—উচ্চফলনশীল জাতের চারা ১৪-১৮ দিনের হলেই লাগান ভাল। ড্যাপোগ পদ্ধতিতে তৈরী চারা ৯-১৪ দিনের মধ্যেই লাগাবার উপযুক্ত হয়।

চারা উঠাবার সময় নজর রাখতে হবে যাতে শিকড় না ছেঁড়ে। শিকড় বেশী ছিঁড়ে গেলে চারা মূল জমিতে লাগতে বেশী সময় নেবে। ভাল চারা যত্ন সহকারে উঠালে ৩-৪ দিনে জমিতে দাঁড়িয়ে যায় ও পাশকাঠি ছাড়তে শুরু করে।

চারার সংখ্যা :

একটা চারা থেকে জৈবিক বৃদ্ধির অবস্থায় ৪০টা পর্যন্ত পাশকাঠি ছাড়তে পারে। কিন্তু এই ভাবে লাগাতে গেলে সময় বেশী নেয় ও খরচ বেশী হয়। তবে ২-৩টি চারা প্রতি গোছে বা হিল-এ লাগান উচিত।

যেসব প্রজাতি পাশকাঠি কম ছাড়ে যেমন—দেশী ধান সেখানে ৫-৬টি চারা লাগান ভাল। চারা লাগানর দূরত্বের ওপর চারার সংখ্যা নির্ভর করে। এছাড়াও দেরীতে চারা লাগালে বা বেশী বয়সের চারা লাগালে বেশী সংখ্যায় লাগান উচিত। শেষ কথা হল—একটি নির্দিষ্ট জমিতে ন্যূনতম চারা লাগান দরকার, যা থেকে প্রয়োজনীয় শীষ আশা করা যায়। বর্তমান গবেষণা থেকে জানা যায় যে চারার সংখ্যা বা দূরত্বের উপর ফলনের প্রভাব খুব কম।

চারা লাগাবার দূরত্ব ঃ উচ্চফলনশীল ধানের বেলায় ২০ সেমি ×২০ সেমি দূরত্বে চারা লাগান উচিত। তাতে প্রয়োজনীয় শীষ ও পুষ্ট দানা পাওয়া যায়। এই হারে লাগালে নিড়ানী যন্ত্রের ব্যবহার সহজ হয়। বেশী পাশকাঠিপ্রবণ প্রজাতির ক্ষেত্রে ২৫ সেমি×২৫ সেমি. দিলে ভাল হয়। জলদি জাতের ধান যা ৯০—১০০ দিনের মধ্যে পাকে তাদের ক্ষেত্রে ২০×১০ সেমি দূরত্বে চারা লাগালে ফলন ভাল হয় ; কারণ অলপদিনের ফসল আশানুরূপ পাশকাঠি ছাড়তে পারে না।

দেশী ও উচ্চফলনশীল প্রজাতির হেক্টর প্রতি ফলন (টন) ঃ—

দূরত্ব (সেমি)	উচ্চফলনশীল প্রজাতি		বেশী পাশকাঠিযুক্ত দেশী লম্বা প্রজাতি
	কম পাশকাঠি	বেশী পাশকাঠি	
১৫×১৫	৬·২	৭·৬	৪·১
২৫×২৫	৫·৭	৮·২	৪·৬
৩৫×৩৫	৫·২	৭·৪	৪·৪
৪৫×৪৫	৪·২	৬·৯	৪·৩
৫৫×৫৫	৩·৫	৬·৫	৩·৬

[উৎস ঃ আন্তর্জাতিক ধান্য গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৬৭]

জাত নির্বাচন ঃ নীচু জমির জাত নির্বাচন নির্ভর করে, কি পরিমাণে বা কতদিন বা কতটুকু উচ্চতায় জমির জল স্থায়ী থাকে। সাধারণভাবে কম জল দাঁড়ায় এমন জমিতে মাঝারি বেঁটে জাতের ধানের পক্ষে উপযুক্ত। ১০ সেমি. জল দাঁড়ায় এই প্রকারের জমিতে মাঝারি লম্বা জাতের অধিক ফলনশীল ধান লাগান যায়। তাছাড়া লম্বা জাতের আলোক সংবেদনশীল দেশী আমন ধানও লাগান যেতে পারে।

খুব নীচু জমির জন্য উচ্চফলনশীল অথচ আলোক সংবেদনশীল জাতের ধান যেমন—সি. এন. ৫৪০, সি. এন. এম. ৫৩৯, সি.আর. ১০১১, ১০১৪, পঙ্কজ, জগন্নাথ ইত্যাদি লাগান যেতে পারে। খুব নীচু জমি যেখানে হঠাৎ জল বাড়ে এমন জমিতে, জলধি ১নং, জলধি ২নং, জলপ্লাবন ইত্যাদি লাগান যায়। বন্যাপ্রবণ এলাকায় এফ. আর. ৪৩বি জাতীয় ধান লাগান যেতে পারে।

নিড়ানী ঃ নীচু জমিতে যেহেতু ভাল জল থাকে, সেই কারণে আগাছা কম দেখা যায় ও আগাছা বাড়তে পারে না। তবুও মুথাঘাস, কচুরিপানা জাতীয় আগাছা পাওয়া যায়। চারা লাগাবার ১৫, ২৫ ও নাবি জাতের জন্য আর একবার ৪৫ দিনের পরে হাত নিড়ানী বা যন্ত্রচালিত নিড়ানীর সাহায্যে নিড়ানী দেওয়া উচিত।

১১.৮ সুসংহত আগাছা নির্মূল ব্যবস্থা ঃ

যেহেতু বিভিন্ন রকমের আগাছা বিভিন্ন অবস্থায় প্রকট হয়ে দেখা দেয়, বিভিন্ন কর্ষণ ব্যবস্থায় নির্মূল করা যায় বা একটি আগাছা অন্য আগাছা থেকে পৃথক, সেই কারণে আগাছা নির্মূল করার একক পদ্ধতি সফল হয় না। কর্ষণ, সেচ, চারা লাগানর দূরত্ব এবং আগাছানাশক ওষুধের প্রয়োগের ব্যবস্থা একসাথে করা উচিত।

১১.৮.১ অন্যান্য পদ্ধতিতে ধান চাষ ঃ

১১.৮.২ বিনা চাষে চারা লাগান অথবা এক চাষে চারা লাগান বা বীজ বোনা।

ধনী কৃষক উন্নতমানের আগাছানাশক ওষুধ প্রয়োগ করে জমির আগাছা নির্মূল করে বীজ বুনে দেন। এইসব জমিতে অবশ্য পর্যাপ্ত পরিমাণে রস থাকে। আবার অনেক চাষী যাঁরা জমিতে জল সরবরাহ বজায় রাখতে পারেন, তাঁরা সরাসরি আগাছা নির্মূল করে সরাসরি চারা লাগান। উভয় ক্ষেত্রেই জমিতে লাঙ্গল দিতে হয় না। একটা চাষ দিয়ে বীজ বা চারা লাগিয়ে দেন।

১১.৮.৩ ধারাবাহিক ধান লাগান বা ধান উদ্যান ঃ

সেচব্যবস্থা ভাল, জমির মান উন্নত এবং রোগ-পোকার প্রবণতা কম হলে, সারা বছর এই জমিতে ধান উৎপাদনের জন্য আলোক সংবেদনশীল নয় এমন ১০০ দিনের জাত নির্বাচন করা যায়। সমপরিমাণে ১৩টি প্লট বা ভূখণ্ডে পর পর ধান লাগালে ১ম প্লটের ধান ১৩নং প্লটে ধান লাগাবার পর কাটা যায়। এইভাবে সারা বছর ধান লাগান যায়। একটি পরিবারের সমর্থ নর-নারীর সাহায্যে এই চাষ করা সম্ভব।

১১.৮.৪ ধান ও মাছের মিশ্র চাষ ঃ

ধান লাগাবার সাথে সাথে মাছের পোনার চাষ করা যায়। এই চাষে

মাছ ও ধান একে অন্যের পরিপূরক। এই চাষে দু' প্রকারের মাছ দু' প্রকারের ধানের সাথে চাষ করা যায়।

● উচ্চফলনশীল স্বল্পমেয়াদী ধানের সাথে শিঙ্গি, মাগুর জাতীয় মাছের চাষ। শিঙ্গি ও মাগুর উভয় জাত সাধারণতঃ মুক্ত বায়ু থেকে অক্সিজেন নেয় এবং মাঝে মাঝে জলের উপরে আসে। এই চলন মাছের বৃদ্ধিতে সহায়ক ও ধানের ফলন বৃদ্ধির সহায়ক।

● নাবি জাতের ধানের সাথে রুই, মৃগেল, কাতলা ও সিলভার কার্প জাতীয় মাছের চাষ হয়। এরা সাধারণতঃ ধানের গোড়ায় চলাফেরা করে থাকে। এই চলন নাবি জাতের ধানের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এই মিশ্রচাষ বর্তমানে হুগলী জেলার পাণ্ডুয়ায় অবস্থিত ক্রিয়াত্মক গবেষণা প্রকল্প এবং ব্যারাকপুরের মৎস্য গবেষণা কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে গবেষণার কাজ চলছে। নীচে সেই গবেষণালব্ধ ফলাফলের কিছু তথ্য তুলে ধরা হল ঃ

১. ধান ও মুক্ত বায়ু সেবন মাছের মিশ্র চাষ ঃ ধানের ফলন, খড় ও মাছের উৎপাদনে জলবায়ুর প্রভাব—

শিঙ্গি, মাগুর মাছের সাথে রত্না, পঙ্কজ ও জয়া জাতের ধানের প্রাক খরিফ, খরিফ ও বোরো চাষের প্রভাব ঃ ৩৫ মি × ১০ মি জমিতে চারা লাগাবার ৭ দিন পরে প্রতি বর্গমিটার জমির জন্য ১টা করে মাছ ছাড়া হয়। জলের মাপ ৮—১০ সেমি সবসময় রাখা হয়। প্রতিদিন পরিমাণ মত খাদ্য দেওয়া হয়ে থাকে। ফলন নিম্নরূপ পাওয়া যায় ঃ—

ফলনের বিবরণ	হেক্টর প্রতি ফলন					
	প্রাক খরিফ-রত্না		খরিফ-পঙ্কজ		বোরো-জয়া	
	মাছবিহীন	মাছসহ	মাছবিহীন	মাছসহ	মাছবিহীন	মাছসহ
দানা	৩·২	৩·৮	৩·০	৩·৭	৫·৯	৬·৪
খড়	৮·১	৮·১	৮·৯	৯·৭	৫·০	৫·৮
মাছ	—	০·৪	—	০·৪	—	০·৫

[উৎস ঃ ৩০ আইরিন ১০ ঃ ১ (ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫)]

২। ধানের মুক্ত বায়ু মাছের মিশ্রচাষ: পরিপূরক মাছের খাবারের প্রতিক্রিয়া—

সুগন্ধী রাধুনীপাগল ধানের (দেশী আমন ধান) জমিতে শিঙ্গি ও মাগুর মাছ অক্টোবর মাসে ছাড়া হয়। ধান জুলাই মাসে লাগান হয় ও ডিসেম্বর মাসে কাটা হয়। ১০টি গাছের বৃদ্ধি ও ফলন এবং ১০টি মাছের বৃদ্ধি ও ওজন মাপা হয়। নিম্নলিখিত ফলন পাওয়া যায়:—

চরিত্র	মাছবিহীন	মাছসহ	
		বিনা খাদ্য	খাদ্য দিয়ে
গাছের বৃদ্ধি	১৩৬	১৩৪	১২৭
শীষের সংখ্যা	১৪	১০	১১
প্রতি শীষে দানার সংখ্যা	১০৬	১০৬	১২১
মাছের বৃদ্ধি (মিমি)	—	৬	২৫
ওজন (গ্রাম)	—	১৭	৪১

[আইরিন ৯ : ২ (এপ্রিল ১৯৮৪)]

৩। গভীর জলে ধান-মাছ মিশ্রচাষ: গবেষক এস. কে. দত্ত ও অন্যান্য—

২·৫ মিটার গভীর জমিতে জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে জলধি ১নং ধান লাগান হয়। জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে কাতলা, মৃগেল, রুই ও সিলভার কার্প মাছের বাচ্চা ৬ : ৬ : ১ : ১ হারে ছাড়া হয় এবং দৈনিক মাছের খাদ্য দেওয়া হয়। ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে ধানের পাকা শীষ কাটা হয় ও জালের সাহায্যে নিয়মিত মাছ ধরা হয় ও পরবর্তী পর্যায়ে বোরো ধান হিসাবে ঐ জমিতে আই. আর. ৩৬ জানুয়ারী মাসে

রোয়া করা হয় ও মাছের ওজন নেওয়া হয়। নীচে ফলাফল দেখান হল—

চরিত্র	জলধি ১		আই. আর. ৩৬	
গাছের উচ্চতা	২৯৫		৬৮	
শীষের সংখ্যা	৩		৯	
দানার সংখ্যা/শীষ	১৭০		৭৯	
হেক্টর প্রতি ফলন	২·১		৪·২	
মাছের হিসাব (জুলাই '৮৩—ফেব্রুয়ারী '৮৪)				
	সিলভার কার্প	মৃগেল	কাতলা	রুই
বৃদ্ধি (মিমি)	৯৫	১০৪	৯০	১১৫
ওজনের বৃদ্ধি (গ্রাম)	৩৪	৮৬	২৭৫	৯৬
হেক্টর প্রতি মাছ ওজন (টন)	০·২	০·৪	০·৪	০·১

[আইরিন ১০ : ২ (এপ্রিল ১৯৮৫)]

৪। ধান ও মুক্ত বায়ু গ্রহণকারী মিশ্রচাষ পদ্ধতির একটি বাস্তব পরীক্ষা :—

এই পরীক্ষা ১৯৮২ সালের আমন চাষে করা হয়। ফলাফল নীচে দেখান হল :—

মাছের ও ধানের বৃদ্ধি ও ফলন (খরিফ ১৯৮২)

চরিত্র	পরীক্ষা		
	মাছবিহীন	মাছ ও ধান	
		খাদ্যবিহীন	খাদ্যসহ
	ধান-রাধুনী পাগল		
উচ্চতা	১৩৫·৫	১৩৪·১	১২৬·৯
শীষের সংখ্যা/প্রতি গাছে	১৩·৬	১০·২	১১·৩
শীষে দানার সংখ্যা	১১৬·৫	১০৬·৪	১২১·০
হেক্টর প্রতি ফলন কেজিতে			
ধান	১৭৯৪·৬	১৮৩৯·৩	১৮৭৮·০
খড়	৪৩৪৫·২	৩৯২৮·৬	৪০৪৭·৬
	শিঙ্গি ও মাগুর		
লম্বায় বৃদ্ধি (মিমি)	—	৫·৭	২৪·৬
ওজনে বৃদ্ধি (গ্রাম)	—	১৬·৫	৪১·১
ফলন/হেক্টর (কেজিতে)	—	১৯৯·৪	৩৭৫·০

১২.১ সার পরিচালনা ঃ

মাটি পরীক্ষা বিজ্ঞানভিত্তিক চাষের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। ধান মাটি থেকে তার প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ করে। সেই কারণে মাটি পরীক্ষা করিয়ে উর্বরতার মান নির্ণয় করা উচিত। পশ্চিমবঙ্গের টালিগঞ্জ, বর্ধমান, মেদিনীপুর, শিলিগুড়ি ও মালদায় অবস্থিত পরীক্ষাগারে মাটি পরীক্ষার সুবন্দোবস্ত আছে। মান অনুযায়ী প্রয়োজনভিত্তিক সুষম সার প্রয়োগ মাটির স্বাভাবিক উর্বরতাশক্তি ফিরিয়ে এনে অধিক ফলনের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী করে; এবং সারের অপচয় বন্ধ করে। সম্প্রসারণ কর্মীরা মাটি পরীক্ষার মান অনুযায়ী পরামর্শ দিয়ে থাকেন। মাটি পরীক্ষাগার থেকে পাওয়া মাটির বিভিন্ন উদ্ভিদ খাদ্য কি আছে তার মাপকাঠি নীচে দেখান হল ঃ

উর্বরতার মান	**জৈব কার্বন** %	**গ্রহণযোগ্য ফসফেট** (কিলো/হেক্টর)	**গ্রহণযোগ্য পটাশ** (কিলো/হেক্টর)
অতি উচ্চ	১·০০ উপরে	১১৫ উপরে	৩৬০ উপরে
উচ্চ	০·৮১-১·০০	৯৩-১১৫	৩০১-৩৬০
মধ্যম	০·৬১-০·৮০	৭১-৯২	২৪১-৩০০
মধ্যনিম্ন	০·৪১-০·৬০	৪৬-৭০	১৮১-২৪০
নিম্ন	০·২১-০·৪০	২৩-৪৫	১২১-১৮০
অতিনিম্ন	০·০০-০·২০	০-২২	০-১২০

পি. এইচ (P^H) মান

মাত্রা	ভাব
৬·০—থেকে কম	অম্ল
৬·০—৮·৫	স্বাভাবিক
৮·৬—৯·০	ক্ষার প্রবণ
৯·০—বেশী	ক্ষার মাটি

দ্রবণীয় লবণের মান

মাত্রা	ভাব
১ মিলিমোর কম	স্বাভাবিক।
১—২	বীজ অঙ্কুরিত হতে অসুবিধা
২—৩	লবণ সহ্যের ক্ষমতা কম কয়েকটি ফসলের পক্ষে ক্ষতিকর।
৩—বেশী	প্রায় সকল ফসলের পক্ষে ক্ষতিকর

১২.২. বিভিন্ন প্রজাতির জন্য সারের চাহিদা ও প্রয়োগবিধি— (কেজি প্রতি হেক্টর জমির জন্য) :

● স্থানীয় বা দেশী আমন জাতের ধান

উর্বরতার মান	নাইট্রোজেন	ফসফেট	পটাশ
অতিউচ্চ	১০	০	০
উচ্চ	২০	০	০
মধ্যম	২৫	১৫	১৫
মধ্যনিম্ন	৩০	১৫	১৫
নিম্ন	৩৫	২০	২০
অতিনিম্ন	৪০	২০	২০

ফসফেট ও পটাশ মূলসার হিসাবে এবং নাইট্রোজেন সার ১/৪ ভাগ মূলসার, রোয়ার ১৫ দিন পরে ১/২ ভাগ ও বাকী ১/৪ ভাগ ৬০ দিন পরে। হালকা মাটিতে পটাশ ৩/৪ অংশ মূলসার ও বাকী ১/৪ অংশ ৬০ দিন পরে চাপান সার হিসাবে।

● রোয়া আউশ (উচ্চফলনশীল)

উর্বরতার মান	নাইট্রোজেন	ফসফেট	পটাশ
অতিউচ্চ	১০	০	০
উচ্চ	২০	২০	২০
মধ্যম	৩০	২৫	২৫
মধ্যনিম্ন	৪০	৩০	৩০
নিম্ন	৫০	৪০	৪০
অতিনিম্ন	৬০	৫০	৫০

পটাশ ও ফসফেট সার মূলসার হিসাবে ও নাইট্রোজেন সার চারা বেরবার ২ সপ্তাহ পরে ১/৩ অংশ, ১৫-২০ দিন পরে ২ বারে বাকী ২/৩ অংশ।

● জলদি আমন (উচ্চফলনশীল) ধান ঃ

উর্বরতার মান	নাইট্রোজেন	ফসফেট	পটাশ
অতিউচ্চ	৪০	০	০
উচ্চ	৪৫	২০	২০
মধ্যম	৫০	২৫	২৫
মধ্যনিম্ন	৬০	৩০	৩০
নিম্ন	৭০	৪০	৪০
অতিনিম্ন	৮০	৫০	৫০

হালকা মাটিতে পটাশ ২ বারে ৩/৪ অংশ মূলসার ও ১/৪ অংশ রোয়ার ৪৫ দিন পরে ; ফসফেট পুরা অংশ মূলসার হিসাবে ও নাইট্রোজেন, অতিউচ্চ ও উচ্চমানের ক্ষেত্রে রোয়ার ১৫ দিন পরে ১/৩ অংশ ও ৪৫ দিন পরে ২/৩ অংশ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে মূলসার ১/৪ অংশ, ১৫ দিন পরে ১/২ অংশ ও ৪৫ দিন পরে ১/৪ অংশ।

● মাঝারি জাতের (উচ্চফলনশীল) ধান ঃ

উর্বরতার মান	নাইট্রোজেন	ফসফেট	পটাশ
অতিউচ্চ	৪০	০	০
উচ্চ	৫০	২০	২০
মধ্যম	৬০	৩০	৩০
মধ্যনিম্ন	৭০	৪০	৪০
নিম্ন	৮০	৫০	৫০
অতিনিম্ন	৯০	৬০	৬০

ফসফেট ও পটাশ সার মূলসার হিসাবে এবং নাইট্রোজেন সার ১/৪ অংশ মূলসার ও রোয়ার ২০ দিন পরে ১/২ ভাগ ও ৫৫ দিন পরে বাকী ১/৪ অংশ চাপান সার হিসাবে দিতে হবে।

● অধিক ফলনশীল দীর্ঘমেয়াদী বোরো ধান

উর্বরতার মান	নাইট্রোজেন	ফসফেট	পটাশ
অতিউচ্চ	৭০	৩০	৩০
উচ্চ	৯০	৪০	৪০
মধ্যম	১০০	৫০	৫০
মধ্যনিম্ন	১১০	৬০	৬০
নিম্ন	১২০	৭০	৭০
অতিনিম্ন	১৪০	৮০	৮০

ফসফেট পটাশ ও নাইট্রোজেনের ১/৪ অংশ মূলসার ও বাকী ১/২ অংশ নাইট্রোজেন রোয়ার ২৫ দিন ও অবশিষ্ট ১/৪ অংশ ৬০ দিন পরে দিতে হবে।

● অধিক ফলনশীল জলদি জাতের বোরো ধান

উর্বরতার মান	নাইট্রোজেন	ফসফেট	পটাশ
অতিউচ্চ	৪০	০	০
উচ্চ	৫০	২০	২০
মধ্যম	৬০	৩০	৩০
মধ্যনিম্ন	৭০	৪০	৪০
নিম্ন	৮০	৫০	৫০
অতিনিম্ন	১০০	৬০	৬০

সারের প্রয়োগ দীর্ঘমেয়াদীর অনুরূপ, কেবল চাপান সার ৫৫ দিন পরে দিতে হবে।

১২.৩ অম্ল মাটিতে অম্লত্ব দূর করবার জন্য হেক্টর প্রতি চুন জাতীয় পদার্থ প্রয়োগের হার (টন) নীচে দেওয়া হল ঃ

চুন জাতীয় পদার্থ	হালকা মাটি	মাঝারি মাটি	ভারী মাটি
চুনা পাথর	২·৫	৫·০	৭·৫
বেমিগ স্লাগ	১·২৫	২·৫	৩·৭৫
চক স্লাগ	১·২৫	২·৫	৩·৭৫

চুন জাতীয় পদার্থ	হালকা মাটি	মাঝারি মাটি	ভারী মাটি
গুড়ো চুন	১.২৫	২.৫	৩.৭৫
তুষের ছাই	১.২৫	২.৫	৩.৭৫
ডলোমাইট	১.০০	১.৫	২.০০

জমি তৈরীর একমাস আগে ভাল করে মিশিয়ে দিতে হবে।

১২.৪ এক হেক্টর ধানের জমি থেকে ফসল কাটার পর কি কি খাদ্য ধান জমি থেকে গ্রহণ করে তা দেখান হল ঃ

খাদ্যের নাম	ফসল কাটার সময় কতটা খাদ্য চলে যায় (কেজিতে)			এক টন খাদ্যের তৈরী করতে কতটা খাদ্য চলে যায় (কেজিতে)	
	খড়	দানা	মোট	খড়	দানা
নাইট্রোজন	৩৭.৪	৮৬.১	১২৩.৫	৫.৩	১০.৯
ফসফেট	৫.৬	১৫.৮	২১.৪	০.৮	২.০
পটাশ	৯৫.৯	২৪.৫	১২০.৪	১৩.৬	৩.১
ক্যালসিয়াম	২৭.৫	৪.০	৩১.৫	৩.৯	০.৫১
ম্যাগনেসিয়াম	১৮.৩	৮.৭	২৭.০	২ ৬	১.১
সালফার	৪.৯৮	৭.৯০	১২.৪	০.৭	১.০
লোহা	১.৪	০.৩	১ ৭	০.২	০ ০৪
মাঙ্গানীজ	৪.০	০.৩৮	৪ ৩৮	০ ৬	০.০৫
দস্তা	০.২	০.০৯	০.২৯	০ ০৩	০ ০১
তামা	০.০২১	০.০৪০	০.০৬১	০ ০০২৯৮	০.০০৫০৬
বোরণ	০.০৬৩	০.০৩	০ ০৯৩	০.০০৮৯	০.০০৩৮
সিলিকন	৫২১.৭০	১৩২.৭২	৬৫৪.৪২	৭৪ ০০	১৬.৮০
ক্লোরিন	১২.৬৯	১২ ৬৮	২৫.৩৩	১ ৮	১.৬

ডাঃ কে. দত্ত—প্রীনসিপলস্ অ্যান্ড প্রাকটিসেস অব রাইস প্রোডাকসন, ১৯৮১ পৃ. ৩৬৫।

উপরের তথ্য থেকে জানা যায় যে এন. পি. কে এবং ক্যালসিয়াম ও সিলিকন প্রচুর পরিমাণে মাটি থেকে চলে যায় :কিন্তু কোন ভাবেই পূরণ হয় না।

১২.৫ নাইট্রোজেন সারের ব্যবহার ঃ

পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে নাইট্রোজেন সারের ঘাটতি আছে। এই কারণে, নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ করলে ধানের সজীবতা বৃদ্ধি পায় ও ফলন বাড়ে। ডাঙ্গা জমিতে ও কাদা করা নীচু জমিতে নাইট্রোজেন সার প্রয়োগের প্রভেদ আছে।

ধানের জমিতে জল জমে থাকলে কি হয় ? ঃ

ডাঙ্গা জমিতে বা যে জমিতে জল জমতে পারে না, সেখানে মাটির নীচে ফসলের শিকড়ে যে সব জীবাণু থাকে তারা পর্যাপ্ত অক্সিজেন পায়। সর্বদা বায়ুমণ্ডলে যে অক্সিজেন আছে তা সরাসরি মাটির ভেতরে প্রবেশ করতে পারে এবং মাটির নীচের কার্বন ডাই-অকসাইড্ বায়ুমণ্ডলে চলে আসতে পারে। যখন জমিতে জল জমে থাকে তখন অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়। প্রথম অবস্থায় মাটির ভিতরের যেসব খালি জায়গা আছে, যেখান থেকে জমে থাকা বায়ু সরে যায় এবং সেই স্থান জল দখল করে নেয় ঃ ফলতঃ বায়ুমণ্ডল থেকে অক্সিজেন আর মাটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে না। মাটির

উপর স্তরে যে জীবাণু (মাইক্রো অরগানিজম) সামান্য পরিমাণ জল ভেদ করে আসে তা সদব্যবহার করে নেয় ও পরে মাটির আরও নীচে চলে যায়। এর ফলে জলে আবদ্ধ জমিতে দু'টি স্বতন্ত্র স্তর সৃষ্টি হয়। একটি ১/২" স্তর যাতে অক্সিজেন থাকে এবং যেসব জীবাণু অক্সিজেন ছাড়া বাঁচতে পারে না, তারাই এই স্তরে থাকে।

দ্বিতীয়টি একটি মোটা স্তর যেটা প্রথম স্তরের নীচে সৃষ্ট হয়। ওই স্তরে অক্সিজেন থাকে না, কেবল ওই সব জীবাণু থাকে যারা অক্সিজেন ছাড়া নিজেদের জীবন ধারণ করতে পারে।

অক্সিজেনবিহীন মাটিতে নাইট্রোজেনঘটিত সারের অবস্থা কি হয় ?ঃ

অক্সিজেনপূর্ণ মাটির স্তরে নাইট্রেট-নাইট্রোজেন সার স্থায়ী অবস্থায় থাকে। যেহেতু নাইট্রেট-নাইট্রোজেন জলে দ্রবণীয় ইহা সহজে চুইয়ে মাটির নীচের স্তরে চলে যায়। এই নাইট্রেট-নাইট্রোজেন যখন অক্সিজেনবিহীন মাটির স্তরে পেঁছায় তখন যেসব জীবাণু অক্সিজেন ছাড়াই বংশবৃদ্ধি করে থাকে, তারা এই নাইট্রেট-নাইট্রোজেনকে মুক্ত নাইট্রোজেনে পরিবর্তন করে এবং মুক্ত নাইট্রোজেন বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। একেই ডিনাইট্রিফিকেশন বলে।

যখন এমোনিয়া-নাইট্রোজেন জমিতে দেওয়া হয়, তখন প্রথম স্তরে অবস্থিত জীবাণু, যারা অক্সিজেনের সাহায্যে বংশবৃদ্ধি করে, এমোনিয়াকে নাইট্রেটে পরিবর্তন করে। এই অবস্থায় ফসল শিকড়ের সাহায্যে নাইট্রেট নিতে পারে (যতক্ষণ এমোনিয়া-নাইট্রোজেন প্রথম স্তরে থাকবে)। কিন্তু যখন এমোনিয়া-নাইট্রোজেন দ্রবণীয় অবস্থায় মাটির নীচের স্তরে চলে যায় তখন আবার আগের মতন এনারোবিক জীবাণুর প্রক্রিয়ায় মুক্ত নাইট্রোজেন হয়ে বায়ুমণ্ডলে চলে যায়।

১২.৬ অক্সিজেনবিহীন মাটির স্তরে কোন প্রকারের এরোবিক অরগানিজম্ বা জীবাণু থাকে না, সেই কারণে এমোনিয়াম-নাইট্রোজেন জাতীয় সার এই স্তরে সরাসরি প্রয়োগ করলে নাইট্রেট-নাইট্রোজেনে পরিবর্তিত হয় না এবং ফসলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হিসাবে থাকে। তাছাড়া, জৈব বস্তু ও মাটির রস এই কারণে দ্রবণীয় হয়ে মাটির নীচে চুইয়ে যেতে পারে না।

নাইট্রেট-নাইট্রোজেন অক্সিজেনপূর্ণ মাটির স্তরে দিলে কোন পরিবর্তন হয় না, কিন্তু অক্সিজেনবিহীন মাটির স্তরে চুইয়ে যেতে

পারে। এমোনিয়া-নাইট্রোজেন এই স্তরে দিলে নাইট্রেট-নাইট্রোজেন পরিবর্তিত হবে।
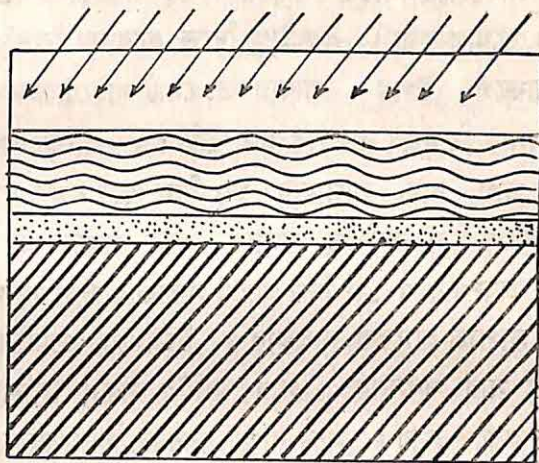
এমোনিয়া-নাইট্রোজেন অক্সিজেনবিহীন মাটির স্তরে প্রয়োগ করলে চট করে চুইয়ে যায় এবং মুক্ত-নাইট্রোজেন হিসাবে বায়ুস্তরে চলে যায় বা ডিনাইট্রিফায়েড হয়।

উপযুক্তভাবে নাইট্রোজেন সার জমিতে প্রয়োগ করলে ভাল করে ধরে রাখা যায় যা ফসল ধীরে ধীরে গ্রহণ করতে পারে।

১২.৭.১ ধান গাছ এমোনিয়াকাল নাইট্রোজেন সব থেকে ভালভাবে গ্রহণ করে যখন এই সার নীচু স্তরে বা রিডিয়ুস্ট লেয়ার এ প্রয়োগ করা হয়। এই সার সবসময় কমপক্ষে ১/২″ বা ১.২৫ সেমি নীচে প্রয়োগ করা উচিত। ৪″—৫″ নীচে পর্যন্ত এমোনিয়া-নাইট্রোজেন স্থিতিশীল থাকে এবং গাছ প্রয়োজনমত গ্রহণ করতে পারে।

১২.৭.২ এমোনিয়াকাল নাইট্রোজেন, মূলসার হিসাবে শেষ চাষের আগে প্রয়োগ করা উচিত এবং সম্ভব হলে মাটি উলটান লাঙ্গলের সাহায্যে মাটির গভীরে মিশিয়ে দেওয়া দরকার। সার প্রয়োগ করার পরেই জমিতে জল দিয়ে ভরে দিতে হবে। সাথে সাথে চারা রোপণ করা

উচিত। এমোনিয়াকাল নাইট্রোজেন মূলসার হিসাবে ব্যবহার করা উচিত।

১২.৭.৩ নাইট্রোজেনঘটিত সারের সুষ্ঠু ব্যবহারের উৎকৃষ্ট উপায় হল বারে বারে প্রয়োগ করা। কতটুকু দিতে হবে তা নির্ভর করবে মাটি পরীক্ষার ফলাফলের উপর। সাধারণতঃ মোট নাইট্রোজেনঘটিত সারের ১/৪ অংশ মূলসার হিসাবে ব্যবহার করা উচিত। বাকি অংশ ২ বারে ; প্রথমবার ১/২ ভাগ, চারা লাগাবার ১৫ দিন পরে যখন পাশকাঠি ছাড়ে ও বাকী ১/৪ অংশ ভ্রূণ সৃষ্টির সময়। মনে রাখতে হবে যে চোখে দেখা যায় এমন অবস্থার ৭-১০ দিন আগে সত্যকার ভ্রূণ সৃষ্টি হয়।

১২.৭.৪ **চাপান সারের ব্যবহার ঃ** ইউরিয়া, এমোনিয়াম সালফেট বা ঐ জাতীয় সার সবসময় ৫ গুণ মাটির সাথে মিশিয়ে নিয়ে তবে জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। মনে রাখা দরকার, সার সমান করে জমিতে ছিটোতে হবে। অথবা মাটির বল তৈরী করে প্রয়োজনীয় সার তার মধ্যে দিয়ে ছায়ায় শুকিয়ে নিয়ে প্রয়োগ করা ভাল।

সেচযুক্ত এলাকার দ্বিতীয় চাপান সার জমি থেকে জল বের করে তবে প্রয়োগ করলে সারের সদ্ব্যবহার হয়। এমোনিয়া বা নাইট্রেট সার চাপান সার হিসাবে ব্যবহার করা ; ২৪ ঘণ্টা পরে জমিতে জল ঢুকিয়ে দেওয়া উচিত।

জল বের করে দিলে মাটির ভেতরে অক্সিজেন সহজে যেতে পারে এবং নাইট্রোজেনের ক্ষতি বা ডি-নাইট্রিফিকেশন হয় না। গাছের জৈবিক অবস্থা এমন থাকে যে নাইট্রেট জাতীয় সার সম্পূর্ণ কাজে লাগতে পারে।

১২.৮ **ফসফেট সারের ব্যবহার ঃ** ফসফেট সার সবসময় মূলসার হিসাবে জমি তৈরীর সময় ব্যবহার করা হয়। জমি তৈরীর সময় সার না পাওয়া গেলে চারা লাগাবার ১৫ দিনের মধ্যে (যখন পাশকাঠি ছাড়ে) ফসফেট সার জমিতে প্রয়োগ করা যায়। এরপরে দিলে ফসফেট সার গ্রহণযোগ্য হয় না। পরবর্তী ফসল এই প্রয়োগের উপকারিতা পায়।

১২.৯ **পটাশ সারের ব্যবহার ঃ** পটাশ মূলসার হিসাবে জমি তৈরীর সময় ব্যবহার করা হয়। তবে চাপান সার হিসাবে অল্প পরিমাণে ১/৩ অংশ রোয়ার ৬০ দিন পরে দেওয়া যায়।

১২.৯.১ যখন সব থেকে বেশী পাশকাঠি ছাড়ে তখন পটাশসার শীষের সংখ্যার বৃদ্ধি ও বেশী দানা তৈরী করতে সাহায্য করে।

১২.৯.২ শীষ তৈরীর সময় পটাশসার শীষের সংখ্যা, দানার সংখ্যা ও দানার ওজন বাড়াতে সাহায্য করে।

১২.৯.৩ শীষ তৈরী হবার পরে পটাশসার দানার ওজন বাড়াতে সাহায্য করে।

১২.১০ **জৈব সার ঃ** সারের চাহিদা বৃদ্ধি ও যোগানের অপ্রতুলতা ও তার সাথে মূল্যবৃদ্ধির জন্য পরিপূরক হিসাবে অল্প মূল্যের জৈব সার উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা শুরু হয়েছে। এই ধরনের জৈব সার এখনও গবেষণা স্তরে আছে। কিন্তু অনেক চাষী এইসব জৈব সারের প্রয়োগ শুরু করেছেন। তবে চাষীরা যেটুকু জৈব সার বা আবর্জনা সার তৈরী করেন তা চাষী চাষযোগ্য জমির ২০% অংশেও দিতে পারেন না।

১২.১০.১ **ধইঞ্চা সার ঃ** ধানের জমিতে চারা লাগাবার পরিকল্পনার দিন স্থির হবার ৪৫ দিন আগে হেক্টর প্রতি ৪০ কেজি হারে ছিটিয়ে বুনতে হয়। গাছের বৃদ্ধি যখন ৪´—৫´ হয় বা গাছের বয়স যখন ৩৫—৪০ দিন হয় তখন ওই গাছ চাষ করে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হয়। জমিতে তখন অন্ততঃ ১ ফুট বা ৩০ সেমি সমান জল ছড়িয়ে থাকা দরকার। ১০—১২ দিনের মধ্যে ধইঞ্চা পচে উত্তম জৈব সারে পরিণত হয়। যাঁরা সুপার ফসফেট ধানে প্রয়োগ করেন তাঁরা ধইঞ্চা বোনার সময় জমিতে সুপার ফসফেট ছড়িয়ে মিশিয়ে দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

১২.১০.২ **এ্যাজোলা ঃ** একপ্রকার জলজ ফার্ন। এদের বংশবৃদ্ধি জলের মধ্যেই হয়। এ্যাজোলার পাতার নীচের দিকে একটি কোষ্ঠের ভিতরে নীল সবুজ শ্যাওলা থাকে। এই নীল সবুজ শ্যাওলা বাতাস

থেকে সরাসরি নাইট্রোজেন সংগ্রহ করতে পারে। পরীক্ষালব্ধ তথ্য থেকে জানা যায় যে এক হেক্টর জমিতে ধানের চারা লাগাবার পর যদি এ্যাজোলা ছাড়া হয় এবং ঐ এ্যাজোলা ধানের সাথে সাথে বৃদ্ধি পায় তাহলে এরা ২৫ কেজি নাইট্রোজেন জমিতে দিতে পারে। ১০—১৫ দিন পরে জমির জল বের করে দিলে এ্যাজোলা মাটির উপরে পড়ে থাকে। এবার এ্যাজোলার জৈবাংশ মাটির সাথে ভাল করে মিশিয়ে দেওয়া হয়। দু' দিন পরে আবার জমিতে জল দেওয়া হয়।

১২.১০.৩ **নীল সবুজ শ্যাওলা ঃ** অনেক সময় ধান কাটার পর জমিতে শ্যাওলা দেখা যায়। এরা তিন প্রকারের ঃ ১। নীল, ২। সবুজ ও ৩। নীল-সবুজ। এর মধ্যে নীল ও সবুজ শ্যাওলা উভয়েই ফসলের পক্ষে ক্ষতিকারক কিন্তু নীল-সবুজ শ্যাওলা উপকারী। খুব অভিজ্ঞ লোক ছাড়া ইহা সঠিকভাবে নির্বাচন করা কঠিন। এই কারণে নীল-সবুজ শ্যাওলার জীবাণু প্যাকেটে সংরক্ষিত করে বিক্রয় হয়। এই জীবাণু ছোট ছোট গর্তে চাষ করে বংশবৃদ্ধি করা যায়। পরে মূল জমিতে প্রয়োগ করা হয়। এই শ্যাওলার গবেষণা এখনও চলছে।

১২.১১ বিভিন্ন সারের উদ্ভিদ খাদ্যের পরিমাণ কত তাহা নীচে দেখান হল ঃ

সারের নাম	উদ্ভিদ খাদ্যের পরিমাণ (%)		
	নাইট্রোজেন	ফসফরাস	পটাশ
ক. রাসায়নিক ঃ			
ইউরিয়া	৪৬·০	—	—
এ্যামোনিয়াম সালফেট	২০·৬	—	—
এ্যামোনিয়াম সালফেট নাইট্রেট	২৬·০	—	—
ক্যালসিয়াম এমোনিরাম নাইট্রেট	২৫·০	—	—
এ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড	২৫·০	—	—
সিঙ্গল সুপার ফসফেট	—	১৬·০	—
ট্রিপল সুপার ফসফেট	—	৪৬·০	—

সারের নাম	উদ্ভিদ খাদ্যের পরিমাণ (%)		
	নাইট্রোজেন	ফসফরাস	পটাশ
রক ফসফেট—			
মুসৌরী	—	২৩-২৪˙০	—
পুরুলিয়া	—	২৩˙৩	—
পটাসিয়াম ক্লোরাইড	—	—	৬০˙০
পটাসিয়াম সালফেট	—	—	৫০˙০
এমোনিয়াম ফসফেট	২০˙০	২০˙০	—
ডাই এমোনিয়াম ফসফেট	১৮˙০	৪৬˙০	—
এমোনিয়াম ফসফেট সালফেট	১৬˙০	২০˙০	—
ইউরিয়া এমোনিয়াম ফসফেট	২৮˙০	২৮˙০	—
পটাশ ইউরিয়া এমোঃ ফসফেট	১৪˙০	৩৫˙০	১৪˙০
নাইট্রেফস	২০˙০	২০˙০	—
পটাশযুক্ত নাইট্রেফস	১৫˙০	১৫˙০	১৫˙০
ইফকো এন. পি. কে.	১০˙০	২৬˙০	২৬˙০
খ. ভারী জৈব সার ঃ			
খামার সার	০˙৫-১˙৫	০˙৪-০.৮	০˙৫-১˙৯
শহর কম্পোষ্ট সার	১˙২-২˙০	১˙০	১˙৫
গ্রামীণ কম্পোষ্ট সার	০˙৪-০˙৮	০˙৩-০˙৬	০˙৭-১˙০
গোবর গ্যাসের সার	১˙৬-১˙৮	১˙১-২˙০	০˙৮-১˙২
গ. সবুজ সার (গড়ে) ঃ			
ধইঞ্চা	০˙৬২	—	—
শন	০˙৭৫	০˙১২	০˙৫১
বরবটি	০˙৭১	০˙১৫	০˙৫৮

ঘ. খইল :

সারের নাম	উদ্ভিদ খাদ্যের পরিমাণ (%)		
	নাইট্রোজেন	ফসফরাস	পটাশ
রেড়ী	৫.৫-৫.৮	১.৮-১.৯	১.০-১.১
তুলো বীজ	৩.৯-৪.০	১.৮-১.৯	১.৬-১.৭
মহুয়া	২.৫-২.৬	০.৮-০.৯	১.৮-১.৯
করঞ্জার	৩.৯-৪.০	০.৯-১.০	১.৩-১.৪
নিম	৫.২-৫.৩	১.০-১.১	১.৪-১.৫
কুসুম	৪.৮-৪.৯	১.৪-১.৫	১.২-১.৩
চীনাবাদাম	৭.০-৭.২	১.৫-১.৬	১.৩-১.৪
তিসি	৫.৫-৫.৬	১.৪-১.৫	১.২-১.৩
সরগুজা	৪.৭-৪.৮	১.৮-১.৯	১.১-১.২
সরিষা	৫.১-৫.২	১.৮-১.৯	১.১-১.২
তিল	৬.২-৬.৩	২.০-২.১	১.২-১.৩
ঙ. প্রাণীজ সার :			
রক্ত (শুকনো)	১০.০-১২.০	১.০-১.৫	০.৬-০.৮
মাছের গুঁড়ো	৪.০-১০.০	৩.০-৯.০	০.৩-১.৫
মুরগীর বিষ্ঠা	৭.০-৮.০	১১.০-১৪.০	২.৩-৩.০
শিং ও খুরের গুঁড়ো	১৪.০	১০.০	—
হাড়ের গুঁড়ো	৩.০	২০.০	

১২.১২ **পুষ্টিজাত বিশৃঙ্খলা :** তখনই পুষ্টিজাত বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় যখন কোন উদ্ভিদ কোন খাদ্য বা অনুখাদ্য মাটি থেকে খুব কম বা ক্ষতিকারক মাত্রায় পেয়ে থাকে (তামাকা ও যোশিদা ১৯৭০)। কখনও একাধিক উদ্ভিদ খাদ্য বা অনুখাদ্যের কম বা ক্ষতিকারক মাত্রার যৌগিক ফল দেখা দেয়। এই বিষয় জানতে গেলে আগে জানা দরকার ঃ

১। আপাতদৃষ্ট উপসর্গ ও

২। নাইট্রোজেন সংবেদনশীলতা।

১২.১২.১ **আপাতদৃষ্ট উপসর্গ :** এই উপসর্গ দেখা দেয় যখন মাঠে ধান থাকে। এইসব উপসর্গ রোগ-পোকার আক্রমণ, ঠাণ্ডা বা বেশী তাপমাত্রা, কম বা ক্ষতিকারক মাত্রায় উদ্ভিদ খাদ্যের উপস্থিতি ইত্যাদি। আপাতদৃষ্ট উপসর্গের সঙ্গে কিছু কিছু রোগের উপসর্গ হুবহু মিলে যায়। ঝলসা রোগ বা মরচে রোগ এর উদাহরণ।

দস্তার অভাবের সাথে বেঁটে ঘেসো রোগের উপসর্গের প্রথম অবস্থার মিল আছে আবার কখনও ভুল চাষ পদ্ধতি একই রকম উপসর্গ সৃষ্টি করে থাকে।

১২.১২.২ **নাইট্রোজেন সংবেদনশীল :** অনেক প্রজাতি অধিক নাইট্রোজেন প্রয়োগে ফলন ভাল দেয়। আবার কখনও উচ্চফলনশীল ধান যদিও তাদের নাইট্রোজেন চাহিদা বেশী, নাইট্রোজেন প্রয়োগেও ফলন কম দেয় কারণ মাটিতে দস্তার অভাব থাকে (যোশিদা ১৯৭০)।

১২.১২.৩ **পুষ্টিজাত বিশৃঙ্খলা চেনার পদ্ধতি :**

কি দেখতে হবে : ধানগাছে পুষ্টিজাত বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে, চিহ্নগুলি গাছের উচ্চতা, পাশকাঠি, পাতা ও শিকড়ের মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

গাছের উচ্চতা : গাছের বৃদ্ধি না হওয়া উভয় কারণে হয় ; যেমন, লম্বা জাতের গাছ ব্যাকানী রোগের জন্য বেঁটে হয়।

পাশকাঠি : খাদ্য ও অনুখাদ্য কম বা ক্ষতিকারক মাত্রা অতিক্রম করলে পাশকাঠি কমে যায়।

পাতা : খাদ্য ও অনুখাদ্যের অভাব হলে পাতায় হলুদ, ধূসর অথবা কমলা রং-এর আধিক্য দেখা যায়।

১২.১২.৪ **খাদ্য বা অনুখাদ্যের যাতায়াত :** যে সব খাদ্য বা অনুখাদ্যর যাতায়াত ধীরে ধীরে হয় তাদের অভাব-জনিত চিহ্ন উপরের পাতায় আগে দেখা দেয়। কারণ ওই খাদ্য বা অনুখাদ্য তাড়াতাড়ি পাতার উপরের অংশে পেঁছোতে পারে না। লোহা, চুন ও সোহাগা এই তিন খাদ্যের যাতায়াত ধীরে হয়। এদের অভাব আগে

উপরের পাতায় প্রকাশ পায়। আবার যাদের যাতায়াত দ্রুত হয় তাদের অভাব আগে নীচের পাতায় দেখা দেয় ; কারণ ওই খাদ্য বা অনুখাদ্য দ্রুত উপরের দিকে চলে যায়। নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশ ও সালফার এই ধরনের খাদ্যের অভাব আগে নীচের পাতায় দেখা দেয়।

খাদ্য বা অনুখাদ্যের ক্ষতি বা অভাবজনিত চিহ্ন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নীচের পাতায় আগে দেখা দেয়। কারণ বেশীর ভাগ খাদ্য বা অনুখাদ্য নীচের পাতায় বেশী জমা হয়।

১২.১২.৫ পাতা হলুদ হয় দুই' ভাবে : ● শিরার মধ্য দিয়ে ও ● সর্বাঙ্গবাহী হিসেবে

পটাশ ও ম্যাগনেসিয়াম অভাবজনিত লক্ষণ শিরার মধ্যে হলুদ রং দিয়ে প্রকাশ পায় ও নাইট্রোজেন এবং গন্ধকের অভাবজনিত লক্ষণ সম্পূর্ণ পাতায় হলুদ রং দিয়ে প্রকাশ পায়।

১২.১২.৬ শিকড়, শিকড়ের রং মাটির ভেতরের লোহার উপস্থিতির উপর নির্ভর করে। তাছাড়া গাছ যদি ভাল না হয় বা মাটিতে খাদ্যের অভাব হয় তাহলে শিকড়ও ছোট বা কম হয়। সাধারণতঃ ছোট অবস্থায় বা যখন শিকড়ের বৃদ্ধি হয় তখন শিকড়ের রং সাদা থাকে। কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিকড়ের রং তামাটে বা বাদামী হয়। কারণ মাটিতে আয়রন অকসাইড্ (যাহা প্রচুর পরিমাণে থাকে) এর একটা আচ্ছাদন শিকড়ের উপর পড়ে। মাটিতে লোহার ভাগ কম থাকলে শিকড় সাদা থেকে যায়। আবার বেশী মাত্রায় থাকলে শিকড়ের রং কালো হয়ে যায় এবং একটি দুর্গন্ধ (হাইড্রোজেন সালফাইড) পাওয়া যায়।

১২.১২.৭ উপসর্গ কখন দেখতে হবে : সবসময় উপসর্গ যখন প্রথমে দেখা দেয় তখনই পরীক্ষা করার প্রয়োজন হয়। যখন উপসর্গ ব্যাপক আকারে দেখা দেয় তখন আর পরীক্ষার প্রয়োজন হয় না। কারণ প্রতিকার করা সম্ভব হলেও লাভজনক হয় না। দস্তার অভাব নীচু জমিতে সাধারণতঃ ধান বোনা বা চারা রোয়া করার ২-৩ সপ্তাহের মধ্যে দেখা দেয়।

পরে আবার উপসর্গ মিলিয়ে যায়। সেই কারণে অনেক সময়ে দস্তার উপসর্গযুক্ত জমি পরবর্তীকালে ফাঁকা ফাঁকা দেখায়। লোহার আধিক্য হলে চারা লাগাবার ৭—১৪ দিনের মধ্যে উপসর্গ দেখা দেয়। এই চিহ্ন সাধারণতঃ কাঁকুড়ে বা লালমাটিযুক্ত ডাঙ্গাজমিতে দেখা যায়। আবার একই উপসর্গ জলচাপ জমিতে দেখা যায়। চারা লাগাবার ৭—১৪ দিনের মধ্যেই এই উপসর্গ দেখা দেয়। এই উপসর্গ দেখা দিলেও ফুল আসা পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

১২.১৩ খাদ্য বা অনুখাদ্যের অভাবজনিত উপসর্গ :

● **নাইট্রোজেন :** গাছ বেঁটে হয় ও পাশকাঠি কম হয়। নতুন পাতা ছাড়া অন্যান্য পাতা সরু ছোট ও হলুদ-সবুজ রঙের হয়। পাতা সোজা থাকে পুরোন পাতার রং খড়ের মত হয় এবং মরে যায়।

● **ফসফরাস :** পাতা, পাশকাঠি বা উচ্চতা নাইট্রোজেন-এর অভাবের মত ; কিন্তু পাতার রং ঘন সবুজ হয়। নতুন পাতা সতেজ থাকে ও পুরোন পাতা বাদামী রঙের হয় এবং শুকিয়ে যায়।

● **পটাশ :** গাছ ছোট হয় কিন্তু পাশকাঠির কোন প্রকার ক্ষতি হয় না। পাতা ছোট ও ঝুলে পড়ে এবং ঘন সবুজ হয়। নীচের দিকের পাতায় শিরার উপর দিক থেকে হলুদ হতে থাকে ও পরে বাদামী রং হয়ে শুকিয়ে যায়।

● **গন্ধক :** প্রায় নাইট্রোজেনের অভাবের চিহ্ন দেখা যায় এবং আপাতদৃষ্টিতে দু'টির অভাবের কোন তফাত বোঝা যায় না।

● **চুন :** খুব বেশী হলে তবে উপরের পাতার আগের দিকে বা ডগার অংশ সাদা পাকান হয়ে যায়। আরও বেশী অভাব হলে গাছ ছোট হয়ে যায় এবং ডগার দিক শুকিয়ে যায়।

● **ম্যাগনেসিয়াম :** গাছের উচ্চতা বা পাশকাঠির কোন প্রকারের পরিবর্তন হয় না। পাতা ঢেউ খেলান হয় ও ঝুঁকে থাকে। বাদামী হলুদ রং নীচের পাতার শিরায় দেখা যায়।

• **লোহা ঃ** পুরো পাতা সাদা দেখা যায়।

• **ম্যাঙ্গানীজ ঃ** গাছ বেঁটে হয়ে যায় কিন্তু পাশকাঠির কোন পরিবর্তন হয় না। তবে পাতার অগ্রভাগ থেকে নীচের দিকে শিরার মধ্যে হলুদ দাগ দেখা দেয় পরে ঐ দাগ বাদামী হয়ে যায়। নতুন পাতা ছোট সরু ও হালকা সবুজ রং হয়।

• **দস্তা ঃ** নতুন পাতার মধ্যশিরা হলুদ হয়ে যায়। নীচের দিকের পাতায় বাদামী দাগ দেখা দেয়। পাতার ফলক ছোট হয়ে যায়। গাছের বৃদ্ধি সমান হয় না ও ধান দেরীতে পাকে।

• **সোহাগা ঃ** গাছ বেঁটে হয়ে যায়। পাতা সাদা ও পাকান হয়, চুনের অভাব ও সোহাগার অভাবজনিত উপসর্গ একই রকম হয়। পরে বড় ডিম্বাকার গাঢ় বাদামী রং-এর ছাপ দেখা দেয়। ক্রমশঃ পাতা শুকিয়ে যায়।

• **তামা ঃ** পাতা নীলাভ সবুজ রং নেয়। পরে পাতা শুকিয়ে যায়। পাতার অগ্রভাগে উপসর্গ প্রথমে দেখা দেয়, পরে মধ্যের শিরার পাশ দিয়ে নীচের দিকে নামতে থাকে। নতুন পাতা বের হয় কিন্তু পুরো খুলতে পারে না। পাকান অবস্থায় থেকে যায়। কখনও কখনও ঐ পাতার নীচের অংশ খুলে যায় কিন্তু উপরের অংশ পাকান অবস্থায় থেকে যায়।

• **সিলিকন ঃ** পাতা নরম হয় ও ঝুঁকে পড়ে।

১২.১৪ অনুখাদ্যের আধিক্যের উপসর্গ ঃ

• **লোহা ঃ** নীচের পাতায় ছোট বাদামী দাগ দেখা দেয়। সাধারণতঃ পাতার অগ্রভাগ থেকে নীচের দিকে নামে। পাতা সবুজ থাকে, বেশী হলে পাতা বেগুনী রং নেয়।

• **ম্যাঙ্গানীজ ঃ** গাছ ছোট বা বেঁটে হয় ও পাশকাঠি কম হয়। পাতার ফলক ও খাপে বাদামী রং-এর দাগ দেখা দেয়।

• **সোহাগা ঃ** বড় বাদামী রং-এর গোল বা ডিম্বাকৃতি দাগ পাতার অগ্রভাগে দেখা দেয়। পরে খড়ের রং ধারণ করে ও ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায়।

● এলুমিনিয়াম ঃ হলুদ কমলা রং মেশান দাগ শিরায় দেখা দেয় ; পরে আরও বেশী দেখা দেয়। পরে বাদামী রং আসে।

● লবণ বেশী হলে ঃ গাছের বৃদ্ধি থেমে যায় ও পাতার অগ্রভাগ সাদা হয়। পাশকাঠি বের হয় না।

● আয়োডিন ঃ ছোট বাদামী রং-এর দাগ নীচের দিকের পাতার অগ্রভাগে আগে দেখা দেয় ও পরে পুরো পাতায় ছড়িয়ে পড়ে।

১৩. রোগপোকা ও অন্যান্য ক্ষতিকারক বিপত্তি ও তার প্রতিকার ঃ ধান বিভিন্ন পরিবেশ, আবহাওয়ায় ও মাটিতে উৎপন্ন হয়। কিন্তু উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ার সঙ্গে সবথেকে মানিয়ে বেশী নিতে পারে। এই উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া রোগ ও পোকার বংশবৃদ্ধির সবথেকে অনুকূল ; এবং যেখানে সারা বছর ফসল আবাদ হয় সেখানে রোগ ও পোকার বংশ-বৃদ্ধিও দ্রুত হয়।

রোগ ও পোকা উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে (পশ্চিমবঙ্গ এই অঞ্চলে অন্তর্ভুক্ত) সব থেকে বেশী ক্ষতি করে এবং প্রত্যক্ষভাবে ফলন কমিয়ে দেয়। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে ২৪টি বিভিন্ন স্থানে ও ৬টি সময়কালে নীচুজাতের ধান গড়ে ২.৯ টন/হেক্টর প্রতি ফলন হয়েছে। কিন্তু ঐ একই জায়গায় রোগপোকা দমন করে গড়ে ৫-৩ টন প্রতি হেক্টরে ফলন পাওয়া গেছে। রোগপোকা ইত্যাদি গড়ে ২.৪ টন প্রতি হেক্টরে ফলন কমিয়েছে। ধানে ৭০ রকমের পোকার আক্রমণ হয় ; তার মধ্যে ২০টি উল্লেখযোগ্য। এই ২০টি পোকা ধানের জীবনকালের বিভিন্ন অবস্থায় ক্ষতি করে এবং কেউবা রোগ বিস্তার করতে সাহায্য করে। (পাঠক ১৯৭০)

১৩.১ মাজরা পোকা ঃ যত রকম পোকা আছে তার মধ্যে মাজরা পোকাই সবথেকে ক্ষতিকারক বলে স্বীকৃত। কারণ এই পোকা ধানের সব অবস্থায় ক্ষতি করে। এরা ডাঙ্গা, নীচু, গভীর জলের, এবং ভাসমান ধানের ক্ষতি করে। মাজরা পোকার অপরিণত অবস্থা বা শূককীটের কাণ্ডের ভিতরে কুরে কুরে খাওয়ার ফলে মরা ডগা ও গাছের ফুল আসার

পরে সাদা শীষের সৃষ্টি করে। থোড় আসার আগে ক্ষতি হলে মরা ডগা অবস্থার সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় ধান গাছ নতুন কুশি বা পাশকাঠির জন্ম দিয়ে মরা ডগার ক্ষতির কিছুটা পূরণ করতে পারে। থোড় বা ফুল আসার পর ক্ষতি হলে সম্পূর্ণ শীষ শুকিয়ে যায়; এই অবস্থায় আর ক্ষতিপূরণ হয় না।
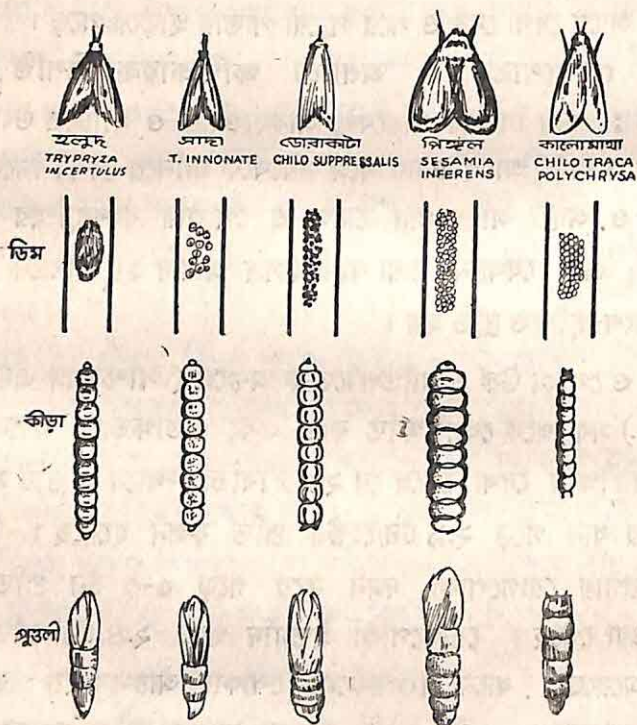
ধানের ফুল আসার সময় এই পোকার আংশিক আক্রমণে কাণ্ডটা যদি সম্পূর্ণ নষ্ট না হয় তবে শীষের নীচে বা যে কোন অংশে ধান চিটা হয়ে যায়।

চাকু দিয়ে লম্বালম্বিভাবে চিরে কাণ্ডে দেখলে বা পোকার খাওয়ার চিহ্ন দেখলে অথবা কাণ্ডের বাহিরের পাতার গোড়ায় বা কাণ্ডের ক্ষতির চিহ্ন যেমন বিবর্ণ কাঁচা দাগ দেখলে মনে করতে হবে যে মাজরা পোকা আক্রমণ করেছে। কয়েক জাতের মাজরা পোকা আছে। অপারিণত

বয়স্ক পোকা বা কীড়া (চিত্র দ্রঃ) দেখে মাজরা পোকার প্রজাতি ঠিক করা যায়। পাতার গোড়ার দিকে বা কাণ্ডের গোড়া থেকে শীষের গোড়া পর্যন্ত যে কোন অংশে মাজরা পোকার কীড়া ও পুত্তলি পাওয়া যায়।

পূর্ণবয়স্ক মাজরা পোকা বা মথ ও ধানের পাতায় ডিমের গাদা দেখলে আসন্ন ক্ষতির সম্ভাবনা অনুমান করা যায়। হলুদ মাজরা

মাজরা পোকা	ডিম	কীড়া	পূর্ণবয়স্ক	কখন ক্ষতি করে	সবথেকে বেশী	কি ধরনের ক্ষতি করে	প্রতিকার
হলদে	সামান্য বাদামী হলদে	হালকা হলদে নরম	বর্শার ফলকের মতন দেখতে, স্ত্রী পোকার দু'টা দাগ আছে পাখার উপর	বীজতলা থেকে কাটা পর্যন্ত	বীজতলা থেকে দানা তৈরী হওয়া পর্যন্ত	কীড়া কাণ্ড ফুটা করে ওইখানেই বড় হয়	সর্বাঙ্গবাহী ও স্পর্শ-জাতীয় ওষুধ
সাদা	ধূসর রং, বাকী হলুদের মতন	সাদা সরু বাকী হলুদের মতন	ঐ কিন্তু রং সাদা ও পাখায় দাগ নেই	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
ডোরা কাটা	মধ্যশিরায় ডিম পাড়ে ১২°C নীচে ডিম পাড়ে না	হালকা কমলা রং ও শরীরে দাগ আছে	পূর্ণবয়স্ক ১৯°—৩৩°C মধ্যে নাড়াচড়া করে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
কালো মাথা	এখনও বিস্তারিত তথ্য নেই	হালকা ধূসর মাথা কালো	ধূসর রং বর্শার ফলক-এর মতন দেখতে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
পিঙ্গল	পাতার খোলার মধ্যে থাকে সাদা রং	হালকা পিঙ্গল রং শেষের দিকে দুটা পা দেখা যায়	বেশ বড়, শক্ত ও মজবুত, ধূসর রং	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

পোকার ডিম আঁশের মতন এবং ফোটার আগে কালো হয়ে যায়। পিঙ্গল জাতের মাজরা পোকা পাতার খোলের বা আবরণীর ভিতরে থাকার দরুন

সহজে নজরে আসে না। ডিম ফোটার পর কীড়া পাতার গোড়ার অংশে চলে যায়। প্রাথমিক অবস্থায় পিঙ্গল ও ডোরা কাটা মাজরা পোকার কীড়া একটি পাশকাঠিতে থাকে। হলুদ মাজরা পোকা অবশ্য আলাদা আলাদা গাছে থাকে।

মাজরা পোকা দমন ঃ হেক্টর প্রতি ১.৫—২.৫ কেজি, ৭০০-৭৫০ লিটার জলে গুলে নিয়ে, যে কোন একটি ওষুধ যেমন ডাইক্লোটাফস্, ডায়াজিনন্, ফসফোমিডন, ফেনেট্রিথিয়ন, লেবাসিড্ বা কার্বারিল ইত্যাদি প্রয়োগ করতে হবে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মাজরা পোকার বিরুদ্ধে ব্যবহৃত সব ওষুধ অন্যান্য ধানের অনিষ্টকারী পোকার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যাবে। কিন্তু অন্যান্য পোকার বিরুদ্ধে ব্যবহৃত ওষুধ মাজরা পোকা দমনে বেশী কার্যকরী হবে না।

১৩.২ ধানের নলি বা গল মাছি বা ভেপু পোকা ঃ কোন কোন স্থানে ফসলের খুব ক্ষতি করে। এ মাছি আক্রমণের ফলে ধানের কান্ড পেঁয়াজকলির মতন নলাকার হয়ে যায়। আক্রমণ বেশী হলে ফসল সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। মাছির কীড়া কান্ডের ভিতরের বাড়ন্ত কচি অংশ খায় ও পরে নলাকার পাতার ভিতরে পুত্তলিতে পরিণত হয়। পুত্তলি থেকে পূর্ণ
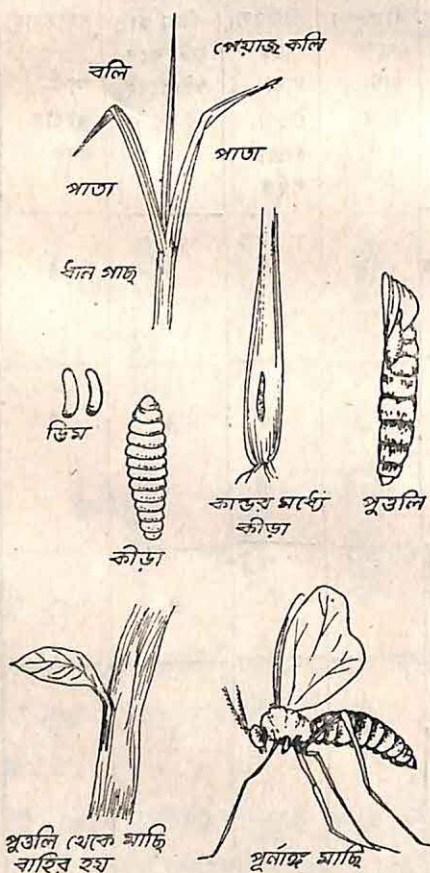
মাছি কাণ্ড ফ্রটো করে নলের ভেতর থেকে বের হয়ে যায়। কীড়া কিছ্রদিন জলের ভেতরে বাঁচতে পারে। ক্ষতিগ্রস্ত ধান গাছে শীষ হয় না। কিন্তু ছড়া হবার পর এই মাছির কীড়া বিশেষ ক্ষতি করতে পারে না। গল মাছি আকারে একটি মশার মত। পেটটা উজ্জ্বল লাল। রাত্রে এ পোকা কর্মব্যস্ত থাকে। পাতার নীচে বা খোলে (লিফ্ সীথ্) এ মাছি ডিম পাড়ে। বর্ষার শ্ররু থেকে শীতের শ্ররু পর্যন্ত ধান ক্ষেতে এরা তৎপর থাকে। ধানের ফসল আক্রমণের আগে ধানের ক্ষেতে এক বা একাধিক জীবনচক্র সম্পূর্ণ করে। ঘাসে বা আলের জঙ্গলে এই পোকার জীবনচক্র ৯-১৪ দিন ও ধানে ৯-১৬ দিন। বীজতলায় আক্রমণ হলে থোড় আসা পর্যন্ত এরা কয়েকবার জীবনচক্র সম্পূর্ণ করতে পারে। দমন—ডেমিক্রন, ফেনিট্রিথিয়ম, মিথাইল প্যারাথিয়ন ইত্যাদি যে কোন একটি ওষ্রধ ১.৪ কেজি প্রতি হেকটরে ৭৫০ লিটার জলে দ্রবণীয় করে ব্যবহার করতে হবে।

ও মিসি মাছি

১৩.৩ পত্র মূলাবর্ত মাছি বা হোর্ল ম্যাগট ঃ

হোর্ল ম্যাগট মাছির কীড়া (ম্যাগট) ধান গাছের পাতার এক পাশ থেকে খেতে আরম্ভ করে। আক্রমণের মাত্রা বেশী হলে গাছ ছোট বা বেঁটে হয়ে যায়। সাধারণতঃ চারা অবস্থা থেকে থোড় আসা পর্যন্ত ধান গাছ আক্রান্ত হয়।

কীট

পুত্তলি

পূর্ণ বয়স্ক মাছিগ্রলি খ্রব ছোট। এক একটি করে ডিম পাড়ে।

ডিম ফোটার পর কীড়া কাণ্ডের মাঝখানে ঢুকে পড়ে ও কচি পাতার পাশগুলি খেতে থাকে। পাতা বের হলে ক্ষতির চিহ্ন স্পষ্ট দেখা যায়।

কীড়ার রং কচিপাতার মত। কীড়া পাতার খোলের মধ্যে থাকে বলে সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না। পুত্তলিগুলিকে আক্রান্ত কাণ্ডের বাইরে পাওয়া যায়। এই পোকা ১ মাসে জীবনচক্র সম্পূর্ণ করে। যে অঞ্চলে অনবরত ধানচাষ হয় সেখানে এ পোকার আক্রমণ বেশী দেখা যায়। এই কীড়ার আক্রমণে পাতার ক্ষতি হয়। আক্রান্ত গাছ বাড়ে না ও দুর্বল হয়ে পড়ে।

এই পোকা দমনের জন্য গল মাছির অনুরূপ ব্যবস্থা নিতে হবে।

১৩.৪ **পামরী পোকাঃ রাইস হিস্পা** বা পামরী পোকা পূর্ণবয়স্ক ও অপরিণত বয়স্ক বা কীড়া অবস্থায় ধান গাছের পাতার ক্ষতি করে।

পূর্ণবয়স্ক পোকা
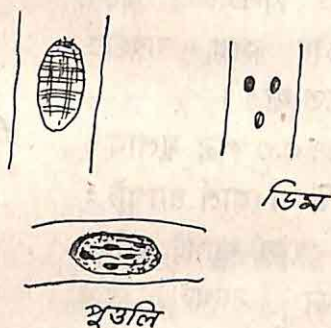
পুত্তলি

পূর্ণবয়স্ক পোকা পাতার সবুজ অংশ খেয়ে পাতার উপরে সরু সরু স্বচ্ছ লম্বা লম্বা দাগ করে দেয়। অধিক সংখ্যক পামরী পোকার আক্রমণের ফলে ফসল রোদে ঝলসান অবস্থা ধারণ করে এবং পাতাগুলি শুকিয়ে যায়। স্ত্রী পোকা পাতার নীচে ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে কীড়াগুলি পাতার ভেতরে ঢুকে দু'দিকের পরদা বা ছাল ঠিক রেখে ভেতরের সবুজ অংশ কুরে কুরে খায়। কীড়া বা পুত্তলি পাতার মধ্যে সহজে দেখা দেয়। পামরী পোকার জীবনচক্র ৩-৪ সপ্তাহের মধ্যে

সম্পূর্ণ হয়। অর্থাৎ ৩-৪ সপ্তাহ পর বংশ বাড়ে। এই পোকা দমনের জন্য গল মাছির অনুরূপ ব্যবস্থা করতে হবে।

১৩.৫ **চুঙ্গি পোকা ঃ** চুঙ্গি পোকার কীড়া পাতা কেটে চুঙ্গি তৈরী করে তার ভেতরে বাস করে বলে পোকার নাম এইরূপ। পুরোনো বীজতলা অথবা নতুন রোয়া ক্ষেতে এই পোকার উপদ্রব বেশী হয়। আক্রান্ত গাছে নাড়া দিলে চুঙ্গিগুলি জলে পড়ে যায়। কীড়া খোলোশ বদলানোর সময় চুঙ্গী পরিবর্তন করে বলে অনেক খালি চুঙ্গী জমিতে জলের উপর ভেসে থাকতে দেখা যায়। এ ভাবে পোকায় খাওয়া সব পাতা রঙ্গীন খোসার মতন সাদা হয়ে যায়। এ পোকা নিশাচর। এর জীবনচক্র প্রায় ৩৫ দিনে সম্পন্ন হয়। এই পোকা দমনের জন্য গল মাছির অনুরূপ ব্যবস্থা নিতে হবে।

চুঙ্গী কীট

১৩.৬ **লেদা পোকা ও শীষ কাটা পোকা ঃ** লেদা পোকা গাছের উপরের অংশে আক্রমণ করে শুধু পাতা মাঝ শিরা ও কান্ডটা অক্ষত রাখে। শীষ কাটা লেদা পোকা গাছের নীচের বিভিন্ন অংশ খায় ও শীষের ডাঁটা কেটে ফেলে। কীটনাশক ওষুধ সাধারণতঃ বাচ্চা কীড়া দেখা গেলে প্রয়োগ করা হয়। এই শ্রেণীর পোকা দমনের জন্য ডাই ক্লোরোভস্, নুভান, কার্বারিল ইত্যাদি প্রয়োগ করা যায়। ওষুধের মাত্রা পামরী পোকা দমনের অনুরূপ।

১৩.৭ **গন্ধী পোকা ঃ** যেসব স্থানে অনবরত ধান চাষ করা হয় ঐ সমস্ত স্থানে গন্ধী পোকার আক্রমণ একটি প্রধান সমস্যা। অপরিণত বয়স্ক ও পূর্ণবয়স্ক পোকা সাধারণতঃ ধানের দুধ বা রস খায়। ফলে ধানের দানা চিটা হয়ে যায় বা অপূর্ণ থাকে। অপরিণত বয়স্ক পোকা

উড়তে পারে না। ধান গাছের রং-এর মতন বলে এরা সহজে নজরে পড়ে না। এই পোকার একপ্রকার দুর্গন্ধ আছে যার জন্য এদের অবস্থান ও ক্ষতি দেখা না গেলেও উপস্থিতি বোঝা যায়।
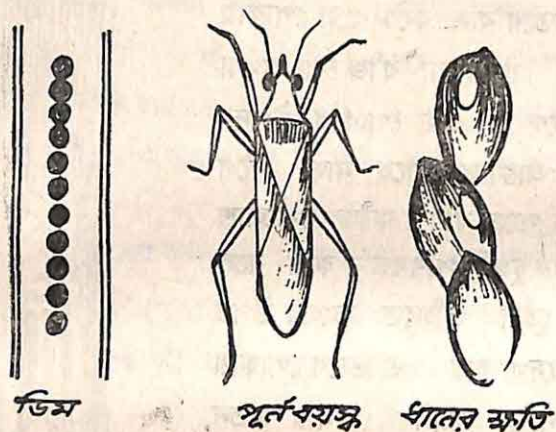
দমন ঃ ম্যালাথিয়ন ও মিথাইল প্যারাথিয়ন, ডায়াজিন-১.৫ কেজি প্রকৃত বিষ (এ. আই.) হেক্টর প্রতি ৭৫০ লিটার জলের মিশ্রণ করে ব্যবহার করতে হবে। ব্যবহারের সময় দুপুর ১২টার পর নির্বাচন করতে হবে, যাতে সকালবেলায় পরাগ মিলনের কোন অসুবিধা না হয়।

১৩.৮ **চিরুনি পোকা বা থ্রিপস্ ঃ** থ্রিপস্ খুব ছোট পোকা। পূর্ণবয়স্ক ও অপরিণত এই দুই অবস্থাতেই এ পোকা ক্ষতি করে। এরা চারা গাছের রস শুষে চারাগুলিকে নিস্তেজ করে দেয়। আক্রমণ বেশী হলে সমস্ত চারাই ফিকে সবুজ বা হলুদ হয়ে যায়। ফুল ফোটার সময় ফুলের ভেতরে ঢুকে গর্ভকোষ নষ্ট করে দেয়। ধান চিটা হয়ে যায়। মাজরা পোকা বা গল মাছি দমনের অনুরূপ ব্যবস্থা এই পোকার জন্য গ্রহণ করা যায়।

১৩.৯ **ঘুরঘুরে পোকা ঃ** এই পোকার আক্রমণ ডাঙ্গা জমিতে ও শুকনো জমিতে দেখা যায়। পূর্ণবয়স্ক পোকা ধানের শিকড় ও কাণ্ডের

নীচের অংশ খায়। অথবা গোড়া কেটে ধান গাছ মেরে ফেলে। মাঠে জল দিলে ঘুরঘুরে পালায় বা মরে যায়। এরা ক্ষেতের আলের মাটির নীচে ডিম পেড়ে এবং মাটির শক্ত খোলস তৈরী করে ডিমগুলি তার মধ্যে রাখে। জমি তৈরীর সময় মাত্রানুযায়ী বি. এইচ. সি. গুঁড়া মাটিতে প্রয়োগ করলে এ পোকার আক্রমণ কম হয়।

১৩.১০ **ধানের কালো শোষক পোকা:** ধানের কালো শোষক পোকা ধানের পাতার রস শুষে ক্ষতি করে। ক্ষতস্থান বাদামী রঙের হয়। এই অবস্থায় ঝলসা রোগ যেমন হয় সেই রকম দেখা যায়। পাতার ডগা ও কিনারা, ডগা পাতা অথবা সম্পূর্ণ গাছ পোকায় খাওয়ার ফলে শুকিয়ে যায়। এছাড়াও কচি পাতাগুলি লম্বালম্বি মুড়ে যায়। খুব শুকনো, ঠাণ্ডা ও গরম আবহাওয়ায় পোকা নিস্তেজ হয়ে পড়ে। আবহাওয়া ভাল হলে পূর্ণবয়স্ক পোকা ধানক্ষেত আক্রমণ করে। ডিমগুলো পাতায়, পাতার খোলে, কাণ্ডের ওপর বা ঘাসের ওপর দুই বা চার সারিতে সাজানো থাকে। সদ্য ফোটা অপরিণত বয়স্ক পোকা প্রথমে ডিমের গাদার নিকট খায় ও পরে গাছের গোড়ার দিকে চলে যায়। পোকার দমন ব্যবস্থা গল মাছি দমনের অনুরূপ।

১৩.১১ **পাতামোড়া পোকা:** পূর্ণাঙ্গ পোকা ছোট, ধূসর রঙের এবং ডানায় কাল লম্বা দাগ আছে। এ পোকা একটা একটা করে ডিম পাতায় পাড়ে এবং পাতা গোল করে মুড়িয়ে তার মধ্যে বাস করে ও পাতার অংশ খায়। ক্ষতিগ্রস্ত পাতা ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায়। পাতামোড়া পোকা খুব ক্ষতিকারক নয় তবে কখনও কখনও ব্যাপক ক্ষতি করে থাকে। গাছ বড় হয়ে গেলে আর কোন ক্ষতি করতে পারে না।

যে কোন সর্বাঙ্গবাহী ওষুধ দিয়ে এর প্রতিরোধ করা যায় (গল মাছির অনুরূপ দমন ব্যবস্থা)।

১৩.১২ **শ্যামা ও শোষক পোকা:** এই পোকা চার প্রকারের পাওয়া যায়।

১। দু' জাতের সবুজ শ্যামা পোকা।

২। বাদামী শোষক পোকা।

৩। সাদাপিঠ গাছ ফড়িং।

৪। আঁকাবাঁকা গাছ ফড়িং।

সবুজ শ্যামা পোকা ঃ পূর্ণাঙ্গ পুরুষ পোকার পাখায় কালো গোল দাগ আছে। রং সবুজ হালকা বা ঘন হতে পারে। এরা গাছের রসকে শুষে খায় এবং ভাইরাস রোগের বাহক। এরা আলোর প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং রাত্রিতে এদের চলাচল হয়।

বাদামী শোষক পোকা : এদের গায়ের রং হালকা বা বাদামী রং হয়। অপূর্ণাঙ্গ পোকার আর এক বিশেষত্ব হল এরা দু' প্রকারের হয়। পাখাযুক্ত ও পাখাবিহীন। এরা প্রচুর সংখ্যায় হয় এবং আর্দ্রতা পছন্দ করে। এই কারণে সাধারণতঃ এরা গাছের গোড়ায় কিন্তু ঠিক জলের ওপরে থাকে। এরা ভাইরাস রোগের বাহক।

আঁকাবাঁকা গাছ ফড়িং : পূর্ণাঙ্গ এই ফড়িং অন্যদের থেকে পৃথক করা যায় অতি সহজে। কারণ এদের ডানায় বাদামী রং-এর আঁকাবাঁকা দাগ পরিষ্কার দেখা যায়। এদের অপূর্ণাঙ্গ বা অপরিণত অবস্থায় গায়ের রং হলুদে ধূসর হয়। ভাইরাস রোগের বাহক।

সাদাপিঠ গাছ ফড়িং : অন্যান্য শোষক পোকা বা ফড়িং-এর মতন এরা গাছের রস শুষে খায়। এদের গায়েয় রং ছাই এবং পিঠের ওপর সাদা দাগ থাকে। এই কারণে একে সাদাপিঠ ফড়িং বলা হয়। এরা সংখ্যায় বেশী থাকে না ও প্রতি বছর বেশী সংখ্যায় দেখা যায় না। তবে অনুকূল আবহাওয়ায় এরা প্রচুর সংখ্যায় থাকে এবং গাছের রস শুষে নিয়ে গাছকে খড়ে পরিণত করে দেয়। এরা ভাইরাস রোগের বাহক নয়।

স্ত্রী পোকা পাতা অথবা পাতার খোলের মধ্য শিরার ভেতরে ডিম পাড়ে। সাধারণতঃ ঐসব পোকার ডিম কলার মতন দেখতে এবং কলার ছড়ার মতন সাজান থাকে। ডিম পাড়ার সময় ডিমের রং সাদা থাকে পরে গাঢ় রং হয়। গায়ে দুটি কালো দাগ দেখা দেয় যা পরে চোখ হয়। এই পোকা খুব তাড়াতাড়ি বংশ বৃদ্ধি করে। যখন ফসলে নাইট্রোজেন সার দেওয়া হয় এবং বাতাসবিহীন গরম আবহাওয়া থাকে, তখন তারা ডিম পাড়ে। এরা গাছের রস শুষে খায় এবং অসংখ্য পোকা যখন গাছে আক্রমণ করে তখন গাছ শুকিয়ে যায়। একেই **হপার বার্ণ** বলে।

শ্যামা পোকা ও ফড়িং-এর চারিত্রিক বিবরণ

নাম	উৎপত্তির স্থান	রোগের বাহক	স্থিতিকাল বা স্থিতীশীল	ক্ষতির বিবরণ	ভাইরাস রোগের চিহ্ন
সবুজ শ্যামা-পোকা	পাতার ডগা বা উপরের দিকে পাওয়া যায়	(i) টুংরো রোগ (ii) বেঁটে হলুদ রোগ	স্থায়ী নয়	পাতার ধারে হলুদ রং হওয়া এবং ব্যাপক অবস্থায় পুঁরো পাতা হলুদ হয়ে যায়	পাতা হলুদ হয়ে যায় এবং শীষে দানা হয় না।
বাদামী শোষক পোকা	গাছের গোড়ায় এবং জলের উপরে পাওয়া যায়	(i) হপার বার্ন (ii) বেঁটে ঘাসী	স্থায়ী	পাতার রস খেয়ে গাছকে ছোট বা বেঁটে করে দেয়	গাছ বেঁটে হয়ে যায়। পাশকাঠি বেশী হয়. পাতা পুঁড়ে যায়। শীষ বাহির হয় না
সাদাপিঠ গাছ ফড়িং	সারা গাছে পাওয়া যায়	বাহক নয়	—	—	—
আঁকাবাঁকা গাছ ফড়িং	সারা গাছে পাওয়া যায়	কমলা রং পাতা ভাইরাস	স্থায়ী নয়	কমলা রং পাতায় দেখা দেয়। গাছ বেঁটে হয়ে যায়	গাছ বেঁটে হয়ে যায়। কোন শীষ হয় না। পাতা কমলালেবু রং-এর হয়।

দমন : মেটাসিসটক্স, ডিমেক্রন, একাটিন ম্যালাথিয়ন, সাইথিয়ন, রোগর, বা তারা ৯০৯ ইত্যাদি ১.৫ কেজি প্রকৃত বিষ (এ. আই.) প্রতি হেক্টরে ৭৫০ লিটার জলে মিশিয়ে চারা লাগাবার ১০, ২০, ৩০, ৫০ ও ৭৫ দিন পরে পরে স্প্রে করা দরকার।

১৩.১২.১ **ধানের রোগঃ** ধানের রোগ কত প্রকার হয় তার একটা তালিকা নীচে দেখান হল ঃ

১। টুংরো রোগ
২। বেঁটে ঘেসো রোগ
৩। বেঁটে হলুদ রোগ
৪। ব্যাকটিরিয়াল ধসা রোগ
৫। ব্যাকটিরিয়াল পাতার দাগ
৬। ঝলসা রোগ

৭। খোলা ধসা রোগ
৮। কাণ্ড পচা রোগ
৯। বাদামী দাগ
১০। পাতার সরু বাদামী দাগ
১১। ফলস স্মাট
১২। খোলা পচা রোগ
১৩। পাতার সাদা অগ্রভাগ
১৪। উফরা রোগ

১৩.১২.২ **টুংরো রোগ ঃ** ১৯৬৩ সালে প্রথম এই রোগ ভাইরাস-জনিত বলে প্রমাণিত হয়। এর আগে এই রোগ ১৯৪০ সালে ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জে বেঁটে রোগ, মালয়েসিয়ায় পেনকিয়াট মেরা বা লাল রোগ ১৯৩৮ সালে ও ১৯৫৯ সালে ইন্দোনেশিয়ায় মেনটেক রোগ নামে প্রচলিত ছিল।

১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম দেখা দেয়। টুংরো রোগ সমগ্র এশিয়া মহাদেশেই হয়। ১৯৪০ সালে ফিলিপিনস্ দ্বীপপুঞ্জে ৩০% ক্ষতির হিসাব পাওয়া যায়।

রোগের চিহ্ন ঃ এই রোগ হলে গাছ ছোট হয়ে যায়। পাতার রং হলুদ অথবা কমলালেবুর মতন হয়। এই হলুদ রং পাতার অগ্রভাগ থেকে শুরু করে পাতার নীচের অংশে নেমে আসে। নতুন পাতা কুঁকড়ে যায় ও পুরান পাতায় লালচে দাগ হয়। গাছ ছোট হওয়া বা
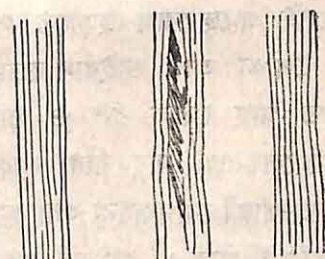
হলুদ হওয়া অথবা কমলা রং হওয়া ইত্যাদি নির্ভর করে ধানের জাত ও কোন্ জাতীয় ভাইরাস জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে তার উপর। টুংরো ভাইরাসের তিনটি উপজাতি আছে 'এস', 'এম' ও 'টি' যারা ধানের বিভিন্ন জাতের বিভিন্ন রোগের চিহ্ন দেখায়। উপজাতির দ্বারা আক্রান্ত হলে গাছ বেশী ছোট হয় না। রোগাক্রান্ত পাতায় আয়োডিন প্রয়োগ করলে পাতা কালো বা ঘন ধূসর রং দেখা দেয় কারণ রোগাক্রান্ত পাতায় প্রচুর স্টার্চ বা মাড় জমা হয়।

রোগের বাহক ও রোগের সংক্রমণ :

শ্যামা পোকা (এর চারটি উপজাতি আছে। যেমন নেফোট্যাটিকস্ ভিরেসেন্স্, নে. নাইগ্রোপিক্টাস, নে. পারভাস, নে. মালায়ালাম) এবং আঁকাবাঁকা পাতা ফড়িং (রেসেলিয়া ডরসালিস বা ইনাজুমা ডরসালিস) এই রোগের বাহক, কিন্তু আঁকাবাঁকা ফড়িং-এর রোগ সংক্রমণ ক্ষমতা তুলনামূলক ভাবে কম। শ্যামাপোকার শতকরা ৮৫টি পোকা রোগ সংক্রমণ ক্ষমতা রাখে এবং রোগগ্রস্ত গাছ থেকে ৩০ মিনিট রস খেলে ভাইরাস গ্রহণ করতে পারে ও নিরোগ গাছের পাতায় ১৫ মিনিট রস খেলে ভাইরাস প্রেরণ করতে পারে। শ্যামা পোকা ভাইরাস গ্রহণ করার সাথে দু' ঘণ্টার মধ্যে নতুন গাছে প্রেরণ করতে পারে আবার ৪-৫ দিন শরীরে রেখে দিতে পারে। এই ৪-৫ দিন শ্যামা পোকা যে গাছে বসে ও রস খায় সেই গাছে রোগ ছড়াতে পারে। এরপরে অর্থাৎ ৫ দিন পরে শ্যামা পোকা আর ভাইরাস ছড়াতে পারে না যদি না আবার সে ভাইরাস আক্রান্ত গাছ থেকে রস ও ভাইরাস বীজাণু সংগ্রহ করতে পারে। জীবনকালে এরা বার বার ভাইরাস গ্রহণ করতে পারে। এই কারণে এদের অস্থায়ী রোগবাহক বলা হয়।

রোগ বিস্তার : যেহেতু শ্যামা পোকার দ্বারা রোগ ছড়ায় সেহেতু ভাইরাস উৎস বা ভাইরাস ইনকুলাম যত বেশী থাকবে ততই রোগ ছড়াবার সম্ভাবনা থাকবে। রোগগ্রস্ত গাছ এবং সহযোগী গাছ যেমন ইলুসিন ইনডিকা, ইকনো ক্লোয়া কোলাম, ইকনো ক্লোয়া ক্রুসগেলী

ইত্যাদি আগাছা নির্মূল করলে রোগের উৎস কমে যাবে। তাছাড়া রোগ সহনশীলজাত নির্বাচন করা দরকার। শ্যামা পোকা মারার জন্য রাসায়নিক ওষুধ প্রয়োগ করা দরকার। যেহেতু গাছ ছোট অবস্থা থেকে এই রোগের আক্রমণ হয় সেই কারণে ছোট অবস্থা থেকে ওষুধ প্রয়োগ করা ভাল। এই রোগ বীজ, ডিম বা মাটি থেকে ছড়ায় না।

১৩.১২.৩ বেঁটে ঘেসো রোগঃ গ্রাসী স্টাণ্ট বা বেঁটে ঘেসো রোগ প্রথমে আন্তর্জাতিক ধান্য গবেষণা কেন্দ্র, ম্যানিলায় ধরা পড়ে ১৯৬২ সালে। পরে অবশ্য শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, ভারত, ইন্দোনেশিয়া ও অন্যান্য দেশেও ধরা পড়ে। এই রোগ বাদামী শোষক পোকার দ্বারা ছড়ায়।

পাতায় দাগ

রোগের চিহ্নঃ রোগাক্রান্ত গাছ খুব সহজেই চেনা যায়। গাছ বেঁটে ও ঘন সবুজ হয়, পাতা সোজা দাঁড়িয়ে থাকে। পাতা চওড়া কম হয় ও মাঝে মাঝে পাতায় দাগ দেখা যায়। বেশী বয়সে এই রোগে আক্রান্ত হলে ভাল পাশকাঠির সাথে রোগাক্রান্ত পাশকাঠি বেরোয়। গাছের ঝাড় থেকে কোন শীষ বের হয় না। গাছ পাকা পর্যন্ত সতেজ থাকে।

রোগের বাহক ও রোগ সংক্রমণঃ ২০-৪০% বাদামী শোষক-পোকা রোগ ছড়াতে পারে। পাখাবিহীন, পাখাওয়ালা পুরুষ ও স্ত্রী সব প্রকারের পোকা ভাইরাস ছড়াতে পারে। পোকা রোগগ্রস্ত গাছ থেকে ভাইরাস বীজাণু গ্রহণ করার পর অন্য সুস্থ গাছে ৩০ মিনিট পর্যন্ত ভাইরাস ছড়াতে পারে। ভাইরাস ১০-১১ দিন পর্যন্ত পোকার দেহে থাকে। কখনও কখনও ২৮ দিন পর্যন্ত থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত পোকা রস খায় ততক্ষণ রোগ ছড়ায়। এই পোকা একবার ভাইরাস গ্রহণ করার

পর সারা জীবনকাল ভাইরাস ছড়াতে পারে। এই কারণে বাদামী শোষক পোকাকে স্থায়ী রোগবাহক বা পারসিস্টেন্ট বলা হয়।

রোগ বিস্তার : রোগের বিস্তার নির্ভর করে রোগাক্রান্ত গাছের উপর। রোগাক্রান্ত গাছ বেশী থাকলে রোগ বেশী হয়। আবার যেহেতু এই পোকা বংশ বিস্তার তাড়াতাড়ি করে তাই অসংখ্য পোকা ব্যাপক আকারে রোগ বিস্তার করতে পারে। পাখাবিহীন পোকা থেকে পাখাওয়ালা পোকা রোগ বিস্তার বেশী করতে পারে। রোগ সহনশীল প্রজাতি ব্যবহার করে রোগ অনেক অংশে কম করা যায়। এই রোগ বীজ, ডিম বা মাটি থেকে ছড়ায় না। এই পোকার কোন সহযোগী গাছের কথা এখনও জানা যায়নি।

১৩.১২.৪ বেঁটে হলুদ রোগ : এই রোগ সর্বপ্রথম ১৯০০ সালে জাপানে ধরা পড়ে। ১৯৫০ সালে গবেষণায় জানা যায় যে এই রোগ একপ্রকার শ্যামা পোকার প্রজাতির (নেফোটেটিকস্ ইনসেনটিসেপস্) দ্বারা সংক্রামিত হয়। এই পোকার কথা অবশ্য ১৯৪৩ সালে প্রথম জানা যায়। এই রোগ বর্তমানে এশিয়া মহাদেশের সব জারগায় দেখতে পাওয়া যায়।

রোগের চিহ্ন : এই রোগ কখনও ব্যাপক হয় না বা খুব বেশী মাত্রায় দেখা যায় না। একই জমিতে ছিটিয়ে ছড়িয়ে দেখা যায়। পাতা হলুদ হয়ে যায়। গাছ বেঁটে হয়ে যায় ও প্রচুর পাশকাঠি ছাড়ে। রোগাক্রান্ত গাছের পাতা হলুদ রং হয়। সাধারণতঃ গাছ মরে না। শীষ হয় না, বা হলেও ভাল হয় না। দেরীতে রোগাক্রান্ত হলে গাছ পরিণত হওয়ার পরও গোড়া থেকে যে নতুন গাছ বেরোয় তাতে ওই চিহ্ন দেখা যায়।
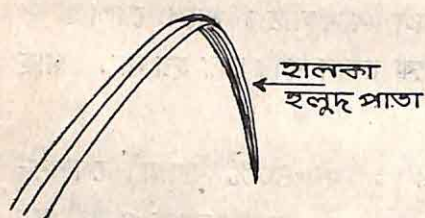
রোগের বাহক ও সংক্রমণ : এই রোগ সর্বপ্রকার শ্যামা পোকার দ্বারা ছড়ায়। এরা হল—১। নেফোটেটিকস্ ভেরেসেনস্, ২। নে.

ইনসেপটিসেপস্ ও ৩। নে. নাইগ্রোপেকটাস। এশিয়া মহাদেশে প্রথম ও তৃতীয় এবং ২নং কেবল জাপানে দেখা যায়। এই পোকা ভাইরাস অথবা মাইকোপ্লাজমা জাতীয় বীজাণু গাছ থেকে সংগ্রহ করে। এদের সংক্রমণ পদ্ধতি টুংরো রোগের অনুরূপ কিন্তু এই পোকারা স্থায়ী বাহক হয়। এই রোগ কিন্তু ঘাসেও দেখা যায়। উন্নত সহনশীলজাত ব্যবহার করা উচিত।

রোগের বিস্তার : যেহেতু বীজাণুর জীবন অনেক দিন থাকে সেইজন্য বহুদিন ধরে রোগ ছড়ায়।

১৩.১২.৫ ব্যাকটিরিয়াল পাতা ধসা রোগ : এই রোগ সর্বপ্রথম ধরা পড়ে জাপানে ১৮৮৪ সালে। এদেশে ১৯৫৯ সালে প্রথম দেখা দেয়। ১৯৬৩ সালে বিহারে ব্যাপক ক্ষতির আগে পর্যন্ত এই রোগের কোন গুরুত্ব এই দেশে ছিল না। শীতপ্রধান দেশে এই রোগ কেবল পাতায় দেখা দেয়। কিন্তু এই মহাদেশে সম্পূর্ণ গাছেই দেখা দেয়। ছোট চারা অবস্থায় একে ক্রেসেক রোগ বলে এবং বয়স বাড়লে এই রোগকে পাতাধসা রোগ বলা হয়।

রোগের চিহ্ন : এই রোগের বিশেষ করে ক্রেসেক অবস্থায় চারা লাগাবার কিছু দিনের মধ্যে দেখা দেয়। চারাগাছ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। বড়গাছে যখন এই রোগ দেখা দেয় তখন গাছের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। এরপরেই গাছে ফুল আসে, এই কারণে শীষ বেরোলেই দানার ওজন ও শীষ ছোট হয়ে যায়। চাল ভেঙ্গে

যায়। যত আগে এই আক্রমণ হবে সেই রকম ফলন কমে যাবে। পাতার ফলকের দুই ধারে মরচে পড়া দাগ দেখা দেয়। মনে হয় যেন জলে ভেজান আছে। কিছুদিনের মধ্যে হালকা হলুদ বা খড়ের রং নেয়। রোগের বীজাণু বেশী থাকলে বা পরিবেশ অনুকূল হলে পাতার খোলায় পর্যন্ত আক্রমণ করে এবং আক্রমণ বেশী হলে দানার গায়ে পর্যন্ত দাগ দেখা যায়।

ক্রেসেক সাধারণতঃ চারা লাগাবার ১৫—২২ দিনের মধ্যে দেখা দেয়, যখন পাতা সাদা বা হালকা হলুদ রং হয়ে যায়। পরে পাতা ও গাছ পচে যায়। পাতার রোগগ্রস্ত অংশটি কেটে জলে দিলে কাটা জায়গা থেকে একটি পদার্থ কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা যায়। ক্রেসেক রোগের সাথে অনেকে মাজরা পোকার ক্ষতির সাদৃশ্য দেখেন। কিন্তু ক্রেসেক গাছের গোড়া চিপে জলে দিলে ব্যাকটিরিয়া মিশ্রিত পদার্থ বেরিয়ে আসে।

রোগের বাহন : জ্যানথোমোনাস্ ওরাইজি নামক একপ্রকারের বীজাণু এই রোগ সৃষ্টি করে। এই বীজাণুকে অনেক ভাইরাস ধ্বংস করে বলে এরা আবার বিভিন্ন উপজাতি বা স্ট্রেন সৃষ্টি করে। এই ধরনের উপজাতি ধানে এই রোগের আক্রমণ তুলনামূলক কম বেশী করে থাকে। এর বংশবৃদ্ধি খুব দ্রুত হয়। বৃষ্টি, শিশির বা সেচের জল ইত্যাদির সাহায্যে এরা গাছের মধ্যে ছড়াতে থাকে। গুদামজাত অবস্থায় বীজবাহক বীজাণু মরে যায় কারণ বেশী তাপমাত্রা এরা সহ্য করতে পারে না। কিন্তু উন্মুক্ত উত্তাপ রোগ ছড়াতে সাহায্য করে। নাইট্রোজেন সার প্রয়োগে রোগের বৃদ্ধি পায়। পটাশ ও ফসফেট সারের স্বল্পতা ও সিলিকন ও ম্যাগনেসিয়াম জাতীয় খাদ্যের আধিক্য এই রোগের বৃদ্ধির সহায়ক।

প্রতিকার : রোগ সহনশীল প্রজাতির ব্যবহার প্রতিকারের একমাত্র উপায়। রাসায়নিক ওষুধ প্রয়োগে এখনও কোন ভাল ফল পাওয়া যায়নি।

১৩.১২.৬ **ব্যাকটিরিয়া পাতার দাগ** (ব্যাকটিরিয়াল লিফ্ স্ট্রেক) : এই রোগ প্রথমে ফিলিপিনস্ দ্বীপপুঞ্জে ১৯১৮ সালে

দেখা যায় এবং ব্যাকটিরিয়াল ধসা রোগ বলেই মেনে নেওয়া হয়। পরে দক্ষিণ চায়নাতে গবেষণায় এই রোগ যে ব্যাকটিরিয়াল ব্লাইট বা ধসা রোগ নয় তা প্রমাণিত হয় এবং এর নামকরণ লিফ্ স্ট্রেক করা হয়। এই রোগ কেবল এশিয়ার নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে পাওয়া যায়। জাপানে এই রোগে হয় না। অনুকূল পরিবেশে এই রোগ ব্যাকটিরয়াল ধসা রোগের মতন ক্ষতি করে।

রোগের চিহ্ন : খুব সরু স্বচ্ছ শিরা ও উপশিরার পাশ দিয়ে দাগ দেখা যায়। আক্রান্ত পাতা সূর্যের দিকে রাখলে স্বচ্ছ দাগ পরিষ্কার দেখা যায়। আর্দ্র আবহাওয়া রোগ ছড়াতে সাহায্য করে। সহজে আক্রান্ত হয় এমন প্রজাতিতে বাদামী বা হলুদ ক্ষত দেখা যায়। ধীরে ধীরে পাতা শুকিয়ে যায়। এই অবস্থায় অনেকে ব্যাকটিরিয়াল ধসা রোগের সাথে ভুল করতে পারে।

রোগের বাহক : এই রোগ জ্যানথোমোনাস্ ট্রানস্লুসেনস্ নামক ব্যাকটিরিয়ার মাধ্যমে ছড়ায়। এই রোগের বীজাণু পাতার পত্ররন্ধ্রের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে এবং ধীরে ধীরে রোগ অন্যান্য পাতায় ছড়ায়। বেশী তাপমাত্রা রোগ ছড়াতে সাহায্য করে—রোগ সহনশীল প্রজাতির ব্যবহার একমাত্র রোগ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করবে।

১৩.১২.৭ ধানের ঝলসা রোগ : রাইস ব্লাস্ট—এই রোগ মনে হয় ধানের সব থেকে পুরান রোগ। ১৬৩৭ সালে চীনদেশের একটি বইতে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। পৃথিবীর সব ধান উৎপাদনকারী দেশে এই

রোগ হয়। শুধু ক্যালিফোরনিয়া ও দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ায় যেখানে আবহাওয়া এই রোগের প্রতিকূল সেখানে এই রোগ হয় না। অনুকূল অবস্থায় এই রোগ ফসলের সম্পূর্ণ ক্ষতি করতে পারে। এই রোগ দু' স্তরে দেখা দেয়।

১. **পাতায় ঝলসা রোগ :** এই অবস্থা ধান গাছের চারা তৈরী থেকে ফুল বেরোবার আগে পর্যন্ত হয়।

২. **শীষের ঝলসা রোগ :** এই অবস্থা ফুল আসার পর থেকে ধান কাটা পর্যন্ত হয়। ভারতে এই রোগ ১৭˙৪% পর্যন্ত ফলন কমিয়ে দিয়েছে এমন প্রমাণ পাওয়া যায়।

রোগের চিহ্ন : এই ছত্রাক পাতার গাঁটে, শীষে এমন কি দানায় ছোট ছোট চোখের মত দাগ সৃষ্টি করে। কিন্তু এই ছত্রাক পাতার খোলের বা আবরণীর কোন প্রকার ক্ষতি করে না। এই চোখের মতন দাগ ছোট বা বড় নির্ভর করে, জাত, পরিবেশ ও ক্ষতের পরিধি বা গভীরতার উপর। এই দাগের রং এর পার্থক্য দেখা যায়। জলীয় আবহাওয়ায় রোগের আক্রমণ বৃদ্ধি পায়। গাছ ছোট অবস্থায় আক্রান্ত হলে মরে যায়। যখন শীষ আক্রান্ত হয় তখন শীষের গোড়া পচে যায় ও "নেক রট" বলা হয়।

পাতায় শরু লম্বা স্বচ্ছ দাগ দেখা যাচ্ছে

রোগের বাহক : এই ছত্রাক রোগের বাহকের নাম পাইরিকুলেরিয়া ওরাইজি। এই ছত্রাকের

অনেক উপজাতি আছে যারা বিভিন্ন ধানের প্রজাতি ও ঘাসকে আক্রমণ করে। এই ছত্রাকের কোনিডিয়া বা বীজ হাওয়ায় ভেসে বেড়ায় এবং অন্বকূল অবস্থায় গাছের পাতায় জীবন শ্বর্ব করে। ৪ ঘণ্টায় বীজ বা কোনিডিয়া অংকুরিত হয় এবং পাতাকে আক্রমণ করে। চারদিনের মধ্যে ক্ষত চিহ্ন দেখা দেয়। জলীয় আবহাওয়া রোগ বিস্তারের সহায়ক।

দমন ঃ হিনোসান জাতীয় ছত্রাকনাশক ওষ্বধ প্রথম অবস্থায় দিলে আক্রমণ দমন করা যায়। তাছাড়া উন্নত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাযুক্ত প্রজাতি ব্যবহার করা উচিত।

১৩.১২.৮ খোলা পচা রোগ ঃ সীথ্ ব্লাইট—ধানের খোলা পচা বা পত্রকোষ ঝলসান রোগও একপ্রকার ছত্রাক (করটিকাম সাসাকাই) দ্বারা সৃষ্টি হয়। আক্রমণের শ্বর্বতে পাতার খোলাতে ছোপ ছোপ মেটে সব্বজ রঙের দাগ হয়। পরে ঐ অংশ পচে যায় বা মরে যায়। রোগ বৃদ্ধি থেকে এভাবে খোলা পাতা ও কান্ড সম্পূর্ণ ঝলসে ও পচে যায়। জলীয় আবহাওয়া রোগ বৃদ্ধির সহায়ক। হিনোসান জাতীয় ওষ্বধ মিশ্রণ ১৫ দিন অন্তর আক্রান্ত জমিতে দিলে উপকার পাওয়া যায়।

১৩.১২.৯ লক্ষীগ্ব বা ভূয়া ছত্রাক পড়া রোগ (ফলনস্মাট) এক প্রকার ছত্রাক—য্বস্টিল্যাগিনয়ডিয়া ভিরেনস্। ধান গাছ দানা হবার সময় যখন দানা সামান্য শক্ত হয় তখন আক্রমণ করে, এর বীজাণ্ব দানাকে আক্রমণ করে। ওইখানে স্পোর বা বীজ প্রস্তুত করে। অসংখ্য

বীজ একটি গুটির মধ্যে থাকে এবং বাড়ন্ত চালকে নষ্ট করে। ওই গুটি পরে ফেটে যায় এবং ময়লা, সবুজ, হলুদ বা নীলাভ কালো রং এর ধূলিকণার মতন ছত্রাক ছড়িয়ে দেয়। বীজ শোধন একমাত্র দমনের উপায়।

১৩.১২.১০ কাণ্ড পচা রোগ (স্টেম রট) ঃ এই রোগ সাধারণতঃ চারা লাগাবার পর হয়। পশ্চিমবঙ্গে এখনও ক্ষতিকারক পর্যায়ে পৌঁছায়নি। এই রোগ "হেলমিন-থোস্পোরিয়াম সিগময়ডিয়াম" ছত্রাক দ্বারা ছড়ায়।

১৩.১২.১১ বাদামী দাগ রোগ (ব্রাউনলিফ স্পট) ঃ একপ্রকার ছত্রাক "হেলমিনথোস্পোরিয়াম ওরাইজি'' দ্বারা সংগঠিত হয়। এই রোগ দ্বারা বীজ পাতা এবং বাড়ন্ত চাল আক্রান্ত হতে পারে। সাধারণতঃ দাগগুলি খুব ছোট, বাদামী রং-এর আকারে তিলের মতন হয় কিন্তু বড় দাগের মধ্যে ভাগ একটু ছাই বা ময়লা রং হতে পারে। সাধারণতঃ ধানগাছে পুষ্টিহীনতার দরুন এই রোগ দেখা দেয়। পটাশ বা দস্তা ইত্যাদির অভাব পূরণ করলেই রোগ দূর হয়। রোগ যেহেতু বীজবাহিত তাই বীজ শোধন করে ব্যবহার করা উচিত। উন্নত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাযুক্ত বীজ লাগান উচিত।

১৩.১২.১২ পাতার সরু বাদামী দাগ ঃ (ন্যারা ব্রাউনলিফ স্পট) এই রোগ "সারকোশপোরা ওরাইজি নামক ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই রোগে পাতায় ছোট ছোট চিকন বাদামী দাগ পড়ে। দাগগুলি মধ্য শিরায় সমানন্তরাল থাকে ; রং লালচে বাদামী হয় এবং দাগের কিনারার রং হালকা হয়, উন্নত প্রজাতিতে রোগ কম হয়।

১৩.১২.১৩ পাতার সাদা অগ্রভাগ রোগ (হোয়াইটটিপ) ঃ এই রোগ একপ্রকার বীজাণু "এফিনোকয়ডিস ওরাইজিত্ত" (নিমাটোড) দ্বারা হয়। এরা গাছের মধ্যে প্রবেশ করে ও রস শুষে নেয়। যেহেতু পাতার অগ্রভাগ সাদা হয়ে যায় তাই ওর নাম "হোয়াইট টিপ" ক্ষতির মাত্রা কখনও ব্যাপক হয় না।

১৩.১২.১৪ উফরা রোগ ঃ এই রোগ একপ্রকার বীজাণু "ডিটিলেনচাষ অগাসটাস" (নিমাটোড) মারফত হয়। এই রোগের বীজাণু সরাসরি বীজের ক্ষতি করে। দানা হয় না। আক্রান্ত জমি থেকে গাছের গোড়া উঠিয়ে মাটিতে পুঁতে দিলে রোগ দমন করা সম্ভব।

১৩.১৩ রোগপোকা দমনে অখণ্ড পরিচালনা ঃ রোগপোকা দমনে অখণ্ড পরিচালনা বা ইণ্টিগ্রেটেড পেস্ট ম্যানেজমেণ্ট একটি সুসংহত ব্যবস্থাপনা। এর জন্য প্রথমতঃ জানা দরকার রোগ পোকা বা অন্যান্য ক্ষতিকারক বীজাণু ইত্যাদির কে, কি, কেন, কবে ও কোথায় সে তথ্য জানতে হবে। মাঠে ফসল নেই, তখন রোগের বা পোকার জীবাণু ডিম কীড়া পুত্তলি ইত্যাদি কোথায় থাকে বা কোন অবস্থায় সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা? উদ্দেশ্য হল ওষুধের উপর নির্ভর না করে বিভিন্ন ব্যবস্থাপনায় এবং মাঠের দিকে নজর রেখে কীটপতঙ্গের সংখ্যা জেনে ক্ষতির মাত্রা কমিয়ে নিয়ে আসা ও বেশী মাত্রায় উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ওষুধ ব্যবহার করে ইকোসিসটেম বা পরিবেশকে বিঘ্ন না করা।

প্রয়োজনভিত্তিক ওষুধ ব্যবহার এবং ক্ষতির মাপ জেনে নিয়ে অন্যান্য ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা উচিত যাতে যান্ত্রিক, পরিচর্যাগত, জীববিদ্যাগত,

রাসায়নিক ও বংশগত পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে রোগ বা কীট দমন করা যায়।

ধানের অবস্থা ও কীটের সমস্যা	আবির্ভাবের সময়		অর্থনৈতিক চৌকাঠ
	বর্ষাকালীন	শীতকালীন	আক্রমণের তীব্রতা
বীজতলা			
ভেপু, মাজরা ও চিরুনি	জুন-আগষ্ট	জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী	মাঝারি থেকে তীব্র
রোয়ার পরে			
হোর্লম্যাগট, মাজরা ও পাতা মোড়া	ঐ	ফেব্রুয়ারী	২০% আক্রান্ত গুছি
মাজরা	ঐ	ঐ	গুছিতে ১টি আক্রান্ত
শ্যামা পোকা	ঐ	ঐ	৫% শুকনো পাতা
ভেপু পোকা	জুলাই-আগষ্ট	—	গুছিতে ১টি কলি
পামরি পোকা	জুন-আগষ্ট	ঐ	গুছিতে ১টি পোকা
রোয়ার মাঝামাঝি			
মাজরা পোকা	আগষ্ট-সেপ্টেম্বর	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	৫% শুকনো পাতা
ভেপু পোকা	ঐ	—	৫% পাশকাঠি
পামরী	ঐ	ঐ	গুছিতে ১টি পোকা
বাদামী শোষক পোকা	ঐ	ঐ	গুছিতে ৫—১০টি পোকা
চুঙ্গী পোকা	ঐ	—	গুছিতে ১—২টি পোকা
শ্যামা পোকা	ঐ	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	গুছিতে ২—৭টি পোকা
পাতা মোড়া পোকা	ঐ	মার্চ	গুছিতে ১—২টি পোকা
শীষ থেকে থোড়			
মাজরা	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর	মার্চ	প্রতি বর্গমিটার ১টি পোকা
পাতা মোড়া	ঐ	ঐ	গুছিতে ১—২টি পোকা
শ্যামা পোকা	ঐ	ঐ	গুছিতে ২০টি পোকা
বাদামী শোষক পোকা	ঐ	ঐ	গুছিতে ৫—১০টি পোকা
ফুল আসার সময় ও পরে			
মাজরা পোকা	অক্টোবর-নভেম্বর	১৫ই মার্চ—১৫ই এপ্রিল	প্রতি বর্গমিটার ১টি মথ
বাদামী শোষক পোকা	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর	এপ্রিল-মে	গুছিতে ১০টির বেশী পোকা
পাকার সময়			
শীষ কাটা লেদা পোকা	ঐ	মার্চ-এপ্রিল	গুছিতে ১—২টি পোকা
গন্ধী পোকা	ঐ	ঐ	ঐ

করণীয় কি ? ঃ

১। নাড়া ও ফসলের অবশিষ্টাংশ চাষ করে উঠিয়ে ফেলা।

২। সহনশীল জাতের চাষ।

৩। আগাম ধানের চাষ।

৪। বীজতলায় আবশ্যিকভাবে ওষুধ প্রয়োগ।

৫। বীজতলায় দানাদার বা তরল ওষুধ প্রয়োগ।

৬। সার প্রয়োগ, নাইট্রোজেন বারে বারে প্রয়োগ করা।

৭। যৌথ বীজতলা।

৮। আগাছাযুক্ত পরিষ্কার-পরিছন্ন চাষ করা।

৯। নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করা। আলোক ফাঁদ মাঠে বসিয়ে, হাত জাল ঘুরিয়ে, গাছ দেখে আঠা মাখানো ফাঁদ বসিয়ে প্রভৃতি বিভিন্ন উপায়ে পোকা ধরে পোকার সংখ্যা জেনে ক্ষতির মাত্রা বোঝা যায়। পোকার সংখ্যা অথবা ক্ষতির মাত্রা অর্থনৈতিক সীমারেখা পেরিয়ে গেলে উপযুক্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিতে হবে।

১০। দানাদার কীটনাশক ব্যবহার করা ভাল কারণ এতে পরজীবী ও পরভুক পোকারা সবথেকে কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

১১। ধানচাষের পর ধান চাষ না করে উপযুক্ত শস্য পর্যায় নিতে হবে।

১২। সেচের জলের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

১৩। জলদি চাষ করা ভাল কারণ নাবি চাষ রোগ ও পোকার সহায়ক।

১৪। আলোক সন্ধানী কীট-পতঙ্গ ধ্বংসের জন্য সমবেতভাবে সন্ধ্যার পর মাঠের আলে আলে আগুন জ্বালিয়ে উপকার পাওয়া যায়।

১৫। বিশেষ ব্যবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেমন—বাদামী শোষক পোকা উপদ্রুত এলাকায় প্রতি ১২ সারি ধান রোয়ার পর ২ সারি ছেড়ে দেওয়া অর্থৎ ফাঁকা রাখা, মাজরা পোকা ও গন্ধী পোকার ডিম

বিনষ্ট করা। গার্মার পোকা দমনের জন্য কেরোসিন তেল মাখান দড়ি টানা ইত্যাদি।

(উৎস ঃ ডাঃ পুণ্যব্রত চট্টোপাধ্যায় জাতীয় কৃষি উপকরণ ১৯৮৩)।

ধান শস্যরক্ষার নির্দেশিকা ঃ

১। রোগ বা পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ করার ক্ষমতাযুক্ত উন্নত-মানের বীজ ব্যবহার।

২। উন্নত প্রথায় কর্ষণ প্রণালীর প্রয়োগ।

(ক) রোগ বা পোকার আক্রমণ হয়নি এমন বীজ ব্যবহার।

(খ) বীজতলায় যত্ন নেওয়া।

৩। প্রথম পোকা বা রোগের আবির্ভাবের উপর নজর রাখা।

৪। সার্ভে ও সারভাইলেন্স (পর্যবেক্ষণ ও ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করা) ঃ

(ক) বর্ডার ক্রপ প্রথা (জমির চারধারে আক্রমণ বেশী না হয় এমন বীজের ব্যবহার)।

(খ) আলোর ফাঁদ ব্যবহার।

(গ) ফিরোমেল প্রয়োগ (রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে পুরুষ পোকাকে আকর্ষণ করা।

৫। পোকার সাধারণ শত্রুদের (মাকড়ি ও অন্যান্য পোকা) নষ্ট না করা।

৬। প্রয়োজনীয় ও সঠিক মাত্রায় সার ও কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগ।

৭। কম মাত্রায় ওষুধ না প্রয়োগ করা।

কি কি যত্ন নেবেন ? ঃ

১। সময়মত চারা লাগান

২। আগাছা মুক্ত চাষ করা

৩। আল পরিষ্কার রাখা

৪। নাইট্রোজেনঘটিত সার বারে বারে প্রয়োগ করা

প্রতিকার ঃ

কান্ড ছিদ্রকারী পোকা (মাজরা) ইত্যাদি ঃ

১। বীজতলায় ১.৩ কেজি কার্বফুরান প্রতি ৬ কাঠা বীজতলায় প্রয়োগ করা

২। কার্বোফুরান ২% দ্রবণে ধানচারার শিকড় ডুবিয়ে নিয়ে তবে চারা লাগান।

৩। ট্রাইকোগামা পোকা জমিতে ছাড়া

৪। ৫% গাছ চারা অবস্থায় আক্রান্ত হলে তবে ওষুধ দেওয়া

গল মাছি ঃ

১। উন্নত জাতের আক্রমণ সহনশীল জাতের (শক্তি) চাষ।

২। আগাম চাষ করা

৩। চারা লাগাবার আগে ২% কর্বোফুরান মিশ্রণে শিকড় ভিজিয়ে নেওয়া।

৪। প্রতি বর্গমিটার জমিতে ১টি পেঁয়াজকলি দেখলে কার্বোফুরান জমিতে প্রয়োগ করা

পামরী, পাতা মোড়া, কাটুই পোকা ইত্যাদির জন্য ঃ

প্রতি ঝাড়ে যখন ১টি পাতা আক্রান্ত দেখা যাবে তখন ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে।

শ্যামা পোকা, শোষক পোকা ঃ প্রতি ছয় ঝাড়ে ১০-২০টি পোকা বা নিম্ফ (বাচ্চা) দেখা দিলে ওষুধ দিতে হবে।

কি ওষুধ দিতে হবে ? ঃ

১। **গুঁড়ো ওষুধ ঃ** যেমন বি. এইচ. সি. ১০% ১০-১২ কেজি/একরে ; চিবিয়ে খায় এমন পোকা ও গন্ধি পোকা দমনের জাত

২। তৈলজাতীয় (সবরকম পোকার জন্য) ঃ

(ক) নুভান ১০০% ২০০ মিলি লিটার/একরে জল ২০০ লিটার

(খ) মেটাসিড্ ৫০% ৩০০ " " / " জল ৩০০ লিটার

(গ) সাইবিয়িন ৫০ ৭৫০ মিলি লিটার/একরে জল ৭৫০ লিটার
(ঘ) লেবাসিড্ ১000 ২০০ „ „ / „ জল ২০০ লিটার
(ঙ) কোরোবান ২০ ৫০০ „ „ / „ জল ৫০০ লিটার

সর্বাঙ্গবাহী (তৈল):

(ক) ডিমেক্রন ১০০ ১২৫ „ „ / „ জল ১২৫ লিটার
(খ) রোগর ৩০ ৩০০ „ „ / „ জল ৩০০ লিটার
(গ) মেটাসিস্টকস্-২৫ ৩০০ „ „ / „ জল ৩০০ লিটার

সর্বাঙ্গবাহী দানাদার:

(ক) ফোরেট ১০ জি ৫ কেজি / „
(খ) ফ্যুরাডান ৩ জি ৭ „ / „
(গ) আইমেট ১০ জি ৪ „ / „
(ঘ) আয়োডেন ৪ জি ১০ „ / „

রোগ ও পোকার ওষুধ (মাকড় ও মিলডিউর জন্য)

(ক) মোরেস্টান ২০০ গ্রাম/একরে ২০০ লিটার জলে মিশিয়ে
(খ) ক্যারামেন ২৫ ৩০০ গ্রাম/ „ ৩০০ লিটার জলে মিশিয়ে
(গ) থোরোসাইড ৩০০ মিলি/ „ ৩০০ লিটার জলে মিশিয়ে

রোগ দমনের জন্য:

১। বীজতলার জন্য:

২৫০-৪০০ গ্রাম প্রতি ১০০ বর্গমিটার বীজতলায় ব্রাসিকল ৭৫% ছড়াতে হবে

অথবা

হেকসামেন ৭৫% ১ কেজি প্রতি ৬০০ বর্গমিটারের জন্য

ঝলসা রোগের জন্য:

(ক) হিনোসান ৫০%—৩০০ মিলি/একর প্রতি ৩০০ লিটার জল মিশিয়ে ছড়াতে হবে।

(খ) কুমান এল—২½ মিলি লিটার/প্রতি লিটার জলে।

অন্যান্য ছত্রাক রোগের জন্য :

সর্বাঙ্গবাহী—বেভিস্তিন ১ গ্রাম প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে ছড়াতে হবে।

ডাইকোলোটন ৮০—১½ কেজি/একরে ছড়াতে হবে।

১৪. ধান কাটা ও গোলাজাত করা :

ধান থেকে চাল : চালই হল বাজার দর ওঠানামার কারণ। চালের দামের সাথে বাজারের অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের মূল্য ওঠানামা করে। চালের দাম নির্ভর করে দানার গঠন, উজ্জ্বলতা ও সম্পূর্ণতার উপর। উজ্জ্বলতা ও সম্পূর্ণতা (আস্ত ও ভাঙ্গা চাল) নির্ভর করে ধান কাটার সময়, পদ্ধতি, ঝাড়া ও পরবর্তী রক্ষণাবেক্ষণের উপর ; আর ধান ভাঙ্গা কল থেকে ভাল চাল বেরোনর উপর নির্ভর করে চালের দাম।

ধান কাটা : পশ্চিমবঙ্গের প্রাকৃতিক অবস্থা অনুযায়ী ধান কাটার পদ্ধতিও ভিন্ন। সাধারণতঃ এখন কাস্তের সাহায্যে ধান কাটা হয়। ডাঙ্গা জমিতে প্রায় মাটির কাছ থেকে ধানগাছ কেটে ও আঁটি বেঁধে খামার প্রাঙ্গণে আনা হয়। যত নিচু জমির ধান কাটা হয় তত মাটির উপরে কাণ্ডের অংশ রেখে ধান কাটা হয়। অতি নীচু জমিতে অর্ধেক অংশ মাঠেই থেকে যায়। কিছু কিছু এলাকায় নৌকা করে শুধুমাত্র শীষ কেটে নেওয়া হয়। শীষ অবশ্য তখনই কাটা হয় যখন শীষের দানা শক্ত হয়। একটা দানা যখন দাঁত দিয়ে ভাঙলে কট করে শব্দ হয় তখনই ধরা হয় যে ধান কাটার সময় হয়েছে। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে ধান আগে কাটলে বা উপযুক্ত সময়ের পরে কাটলে ধান চালের অনুপাত ঠিক হয় না।

যখন শতকরা ৮০ ভাগ ধানের রং খড়ের রং নেয় এবং শীষের নীচের দানা খুব শক্ত হয় তখন ধান কাটার উপযুক্ত সময়। ডাঙ্গা জমির ধান সাধারণতঃ নীচু জমির ধান থেকে আগে পাকে।

গোবিন্দ স্বামী ও ঘোষ (১৯৬৮), তাঁদের পরীক্ষায় বলেছেন, ফুল বেরোবার (হেডিং) ২৭-৩৯ দিনের মধ্যে যখন দানায় জলীয় অংশ ১৮—২৩% থাকে, সেইটাই ধান কাটার উপযুক্ত সময়।

উপযুক্ত সময়ের আগে ধান কাটলে অধিক পরিমাণে হালকা ও সাদাটে চাল থাকে ; যা থেকে ধানকলে চাল কমসংখ্যক বের হয়। আবার পরে কাটলে অনেক ধান জমিতে পড়ে যায় ও শতকরা উৎপাদনের হার কমে যায়। বৃষ্টির মধ্যে ধান কাটলে চাল কম বের হয়।

ধান মাড়াই ঃ ধান মাড়াই সাধারণতঃ তিনটি পদ্ধতিতে হয় ঃ

১। হাত দিয়ে পাটাতনের উপর পিটিয়ে।

২। পদচালিত ধান মাড়াই যন্ত্র দিয়ে।

৩। যন্ত্রচালিত ধান মাড়াই যন্ত্র দিয়ে।

১। ধান মাড়াই করার প্রচলিত প্রথা হল পাটাতন বা বাঁশের মাচা করে নিয়ে তার উপর ধানগাছ পিটিয়ে ধান বের করা।

ধানের একটা ক্ষমতা আছে দানার শীষের সঙ্গে নিজেকে ভাল করে যুক্ত করে রাখা। বিভিন্ন প্রজাতির ক্ষমতা বিভিন্ন। যারা এই ক্ষমতার বেশী অধিকারী তাদের দানা বের করতে পরিশ্রম ও খরচ বেশী হয় ; সময় বেশী লাগে। তাছাড়া দানার মধ্যে জলীয় অংশ কতটা পেকেছে বা দানার ওজনের উপর মাড়াই ক্ষমতা নির্ভরশীল।

ইদানিংকালে পদচালিত মাড়াই যন্ত্র ধান ঝাড়ার জন্য ব্যাপক হারে ব্যবহার করা হচ্ছে। এর সাহায্যে মাড়াই করলে ধান কম নষ্ট হয় বা ধান ভেঙ্গে যায় না। এই যন্ত্রের মাড়াই ক্ষমতাও বেশী। একজন চাষী পিটিয়ে যেখানে ২০০ কেজি ধান একদিনে ঝাড়তে পারে সেখানে দুজনে একদিনে মাড়াই যন্ত্রে ৭৫০—৮০০ কেজি ধান মাড়াই করতে পারে। যন্ত্রচালিত মাড়াই কল ঘণ্টায় ২০০ কেজি ধান ঝাড়াই করতে পারে ; কিন্তু যন্ত্রচালিত মাড়াই কল থেকে ২—৩% ধান নষ্ট হয়।

ধান শুকান (ড্রাইং) ঃ ধান গুদামজাত করার সময় ধানের মধ্যের জলীয় অংশ ১৪%-র কম হওয়া বাঞ্ছনীয়। ধান যখন কাটা হয় তখন ২০—২৫% জল থাকে। এই অবস্থায় ধান গুদামজাত করলে রোগ পোকার আক্রমণ, অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা বা ধান চালের হার ইত্যাদির উপর

প্রভাব ফেলবে। এই কারণে ধান মাড়াই করার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ধানকে উত্তম রূপে শুকিয়ে নিয়ে জলের ভাগ ১৪% নীচে নামিয়ে আনতে হবে। তাছাড়া ভালো করে শুকিয়ে না নিলে—১। ধান থেকে চাল কম বের হবে, ২। অংকুরোদ্গম্ ক্ষমতা কমে যাবে। বায়ুমণ্ডল থেকে জলীয় অংশ গ্রহণ করায় গুদামজাত অবস্থায় ধানের মান নষ্ট হবে। পশ্চিমবঙ্গে এখনও সূর্যের তাপের সাহায্যে ধান শুকান হয়। ৪-৫ দিন পরিপূর্ণ সূর্যালোক ধানের জলীয় অংশ ১৪%-এর কমে নামিয়ে আনতে সাহায্য করে। অবশ্য ডায়ার বা মোটর চালিত বাষ্প নিষ্কাশন যন্ত্রের সাহায্যে এই কাজ করা যায়। বৈজ্ঞানিকদের মতে সূর্যের তাপের সাহায্যে ধান শুকান অন্যান্য পদ্ধতি থেকে ভাল এবং লাভদায়ক।

ধান ঝাড়া বা পরিষ্কার ঃ ধান পরিষ্কার করে গুদামজাত করা উচিত। ধান মাড়াই করার পর তা থেকে খড় আগড়া বা চিটা ইত্যাদি পরিষ্কার করা দরকার। কুলো দিয়ে ঝেড়ে ফেলে ও একটু হাত-বাছাই করলে ভালো হয়। প্রাথমিক অবস্থায় প্রাকৃতিক বাতাস ধান ঝাড়তে সাহায্য করে। ঘণ্টায় ১২ কিলোমিটার বায়ুর গতি খড়কুটো ময়লা ইত্যাদি পরিষ্কার করতে সাহায্য করে। এর বেশী গতি (২৪ কিমি/ঘণ্টায়) ১% ধানও চলে যায়। বায়ুর গতি বেশী থাকার সময় ধান ঝাড়াই না করা ভাল।

গুদামজাত করা ঃ কম জলীয় বাষ্প ও ঠাণ্ডা আবহাওয়া দীর্ঘদিন গুদামজাত করার জন্য অত্যন্ত আবশ্যক। এই কারণে গুদামজাত করতে হলে অত্যন্ত সাবধানতার প্রয়োজন। ১৮° সেলসিয়াস্ তাপমাত্রায় এবং ১০-১২% জলীয় অংশ যুক্ত আবহাওয়ায় বীজ ২ বছর কাল পযন্ত গুদামে রাখা যায় ও নষ্ট হয় না। বস্তায় বা মাটির বড় জালায় অল্প পরিমাণে ধান রাখা যায়। যখন বেশী পরিমাণে রাখার প্রয়োজন তখন বীজাগার (সীড্‌বীন) বা পাক ঘর সবথেকে ভাল। ধান বা বীজধান পাত্রস্থ করার আগে পাত্র শোধন করা উচিত। সিদ্ধচাল আতপ চাল থেকে ভালো গুদামজাত হয়।

গুদামে শস্যের ক্ষতি নিম্নলিখিত কারণে হয়ঃ

১। শস্যাগার ভালো না হলে।

২। শস্যাগার বড় হলে, হাওয়া না খেললে বা অপরিচ্ছন্ন থাকলে

৩। ভালো করে শুকনো না করলে।

৪। শুষ্ক বা পরিষ্কার শস্য না রাখলে।

৫। রাসায়নিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা না থাকলে।

৬। ইঁদুর প্রতিরোধ ব্যবস্থা না থাকলে।

১৫. ধানের ফলন কম হয় কেন ?ঃ

আমরা জানি যে, কোন উন্নতজাতের ধান হেক্টর প্রতি কতটা ফলন দেবার ক্ষমতা রাখে। উদাহরণ হিসাবে আই. আর. ৮ আশ্চর্য ধান যাকে
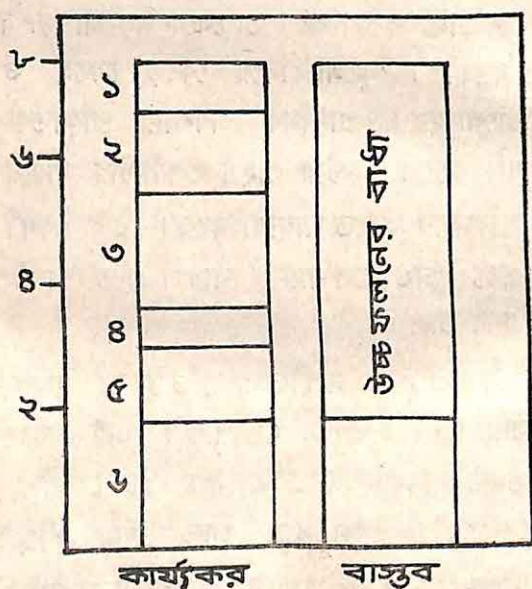
"মিরাকল রাইস" বলা হয়, তার ফলন হল ১০.২ টন/হেক্টর। এটা এখনও পর্যন্ত সর্বকালীন রেকর্ড। কিন্তু যাঁরা ধান চাষ নিয়ে আত্মনিয়োগ করেছেন তাঁরা এখনও শীতকালীন ফসল হিসাবে ধানের ফলন ৬-৭ টন/হেক্টরে বেশী তুলতে পারেননি। নিশ্চয় এর একটা

কারণ আছে। গবেষকরা এখনও এর কারণ খুঁজছেন। হার্চ ও যুইকহাম (১৯৭৫) এ সম্বন্ধে একটি প্রাথমিক তথ্য পরিবেশন করেছেন।

ফলনের ফাঁক গ্যাপ) ঃ

১। বাৎসরিক ব্যবধান
২। কাল (সময়) ২০%
৩। জলের ব্যবহার ৩৫%
৪। আর্থিক ঝুঁকি ২৫%
৫। অন্যান্য অসুবিধা ১০%
৬। ফলন

এই চিত্র থেকে ধারণা করা সম্ভব যে কার্যকরী ফলন পাবার সবথেকে বড় বাধা, জলের ব্যবহার ; এবং তারপরেই লাগাবার সময়ের হেরফের ফলনের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

পরবর্তীকালে গোমেজ ১৯৭৭ সালে আরও বিস্তারিত গবেষণা করেন। তাঁর অনুসন্ধান দু' ভাগে বিভক্ত ছিল।

১। গবেষণালব্ধ ফলনের ১নং ফাঁক বলেছেন।

২। কার্যকরী ফলনের সাথে বাস্তব ফলনের তফাত—এটাকে ফলনের ২নং ফাঁক বলেছেন।

এই ১নং ফাঁক ও ২নং ফাঁককে তিনি এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন ঃ

একটি গবেষণা কেন্দ্রে সব প্রকারের সুযোগ বা সুবিধা পাওয়া যায় বা প্রয়োজনবোধে সৃষ্টি করে নেওয়া যায় যেমন "ফাইটোট্রোন"। ফাইটোট্রোন একটি আধুনিক গবেষণাগার যেখানে যে কোন প্রাকৃতিক পরিবেশকে কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করা যায়। এই কারণে গবেষণাগারে কোন ফসলের বিশেষ করে কোন একটি প্রজাতির সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা নির্ণয় করা সম্ভব। কার্যক্ষেত্রে কিন্তু ওই ফলন পাওয়া যায় না। কেন এই ফলন পাওয়া যায় না, এই বিষয় কোন একটি আন্তর্জাতিক

আলোচনাচক্রে ডাঃ নীল ব্রাডী যিনি কোন এক সময় আন্তর্জাতিক ধান্য গবেষণা কেন্দ্রের সর্বাধক্ষ্য ছিলেন, এবিষয়ে আলোকপাত করেছিলেন।
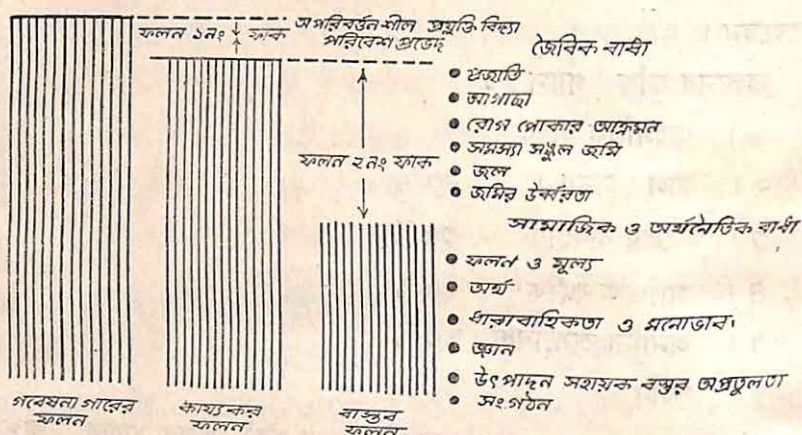
তিনি বলেছিলেন যে এশিয়া মহাদেশে ধানের ফলন কম হবার কারণ হল ঃ—

১৫.১ ১। লাগাবার সময়

২। পর্যাপ্ত সূর্যকিরণের অভাব

৩। রোগ পোকার উপদ্রব

৪। জলের অপ্রতুলতা

৫। অসম সামাজিক ও আর্থনীতিক অবস্থা

এই ফলনের ১নং ফাঁক বা "ঈল্ড গ্যাপ" যেটা গবেষণাগারের তুলনায় কার্যকরী ফলনে পাওয়া যায় তা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সম্ভব নয় কারণ গবেষণাগারের সুযোগ সুবিধা মাঠে বা বৃহত্তর ক্ষেত্রে কখনও পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু ফলনের ২নং ফাঁক বা "ঈল্ড গ্যাপ" কার্যকরী ফলনের তুলনায় বাস্তব ফলনের ফারাক বা তফাত অনেক অংশে কম করা সম্ভব।

১৫.২ বাধাগুলি কি ? ঃ

১৫.২.১ জৈবিক বাধা ঃ

প্রজাতি ঃ উন্নত প্রজাতি যার উৎপাদন ক্ষমতা বেশী এবং জমির জন্য উপযুক্ত এইরূপ প্রজাতির ব্যবহার। ধান বিভিন্ন অবস্থায়, সময়ে ও বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন ফলন দেয়। সময়োপযোগী ও অবস্থা বুঝে উন্নত প্রজাতির ব্যবহার দরকার।

১৫.২.২ **আগাছা ঃ** আগাছা উচ্চফলনের শতকরা ৩০-৪০% কমিয়ে দেবার ক্ষমতা রাখে। কোন কোন সময়ে, বিশেষ করে উচঁু জমিতে ও অত্যধিক বর্ষায় ৭০-৮০% ফলন কম করে দেয়। সেই কারণে আগাছা দমন করা প্রয়োজন। আজকাল বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য আগাছা দমনের সহায়ক। তাছাড়া নিড়ানী যন্ত্রের সাহায্যে ও হাত নিড়ানীর দ্বারা সময় মতন নিড়ানী করলে আগাছা দমন করা সম্ভব হয় এবং সেই সাথে অন্যান্য রোগ পোকা দমনে পরোক্ষ ক্রিয়া করে।

১৫.২.৩ **রোগ ও পোকার আক্রমণ ঃ** এই অঞ্চলে অর্থাৎ নাতি-শীতোষ্ণ অঞ্চলে বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে বৃষ্টিপাত বেশী ও দীর্ঘস্থায়ী হয়। আর্দ্রতাও বেশী থাকে। শীতে তীব্রতাও কম থাকে। দৈনিক গড় তাপমাত্রা ২৫°—২৮° সেলসিয়াসের মধ্যে উঠানামা করে ; যার জন্য রোগ ও পোকার আক্রমণ বেশী হয়। এই অঞ্চলে ওষুধের দাম বেশী ও ওষুধ প্রয়োগের বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির ব্যবহার কম হয়। রোগ ও পোকার আক্রমণ সহনশীল প্রজাতির ব্যবহারও কম হয়। এইসব কারণে ধানে কার্যকরী ফলনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

১৫.২.৪ **সমস্যা সঙ্কুল জমি ঃ** যদিও ধানচাষের যোগ্য জমি এই অঞ্চলে বেশী, কিন্তু বেশীর ভাগ জমি কোন-না-কোন ভাবে উন্নত চাষের অন্তরায়। অম্ল, ক্ষার, লবণাক্ত বা কাঁকুড়ে জমি বেশী ; তাছাড়া আছে ডাঙ্গা ও নীচু জমি ; এমন জমি আছে যেখানে ৪·৫৭ মিটার পর্যন্ত জল জমা থাকে। এইসব কারণে এখানে আশাতীত ফলন পাওয়া সম্ভব নয়।

১৫.২.৫ সেচব্যবস্থাও উৎপাদনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। ভারতের প্রায় ৩০ ভাগ জমি নীচু এবং যেখানে সার প্রয়োগ করাও অনেক সময় সম্ভব হয় না। সেচের সুব্যবস্থা শতকরা ৭০ ভাগ জমিতে নেই। জলনিকাশী ব্যবস্থা শুধুমাত্র ডাঙ্গা জমি ছাড়া কোথাও নেই।

১৫.২.৬ **জমির উর্বরতা ঃ** এই অঞ্চলের জমির উর্বরতা কম। জৈবাংশ কম থাকার জন্য মাটির গঠনও উন্নতমানের নয়। সাধারণ ভাবে নাইট্রোজেন ঘটিত খাদ্যদ্রব্যের অভাব প্রায় সব জমিতে পাওয়া যায়।

১৫.৩ সামাজিক ও আর্থনীতিক বাধা।

১৫.৩.১ **ফলন ও মূল্য** ঃ এখানকার কৃষকেরা উৎপন্ন ফসলের ন্যায্য দাম পায় না। খরচ অনুপাতে বিক্রয় দর কম থাকে। এক বা ২টি ফসল ছাড়া অন্যান্য ফসল কখনই লাভজনক হয় না। সেই কারণে কৃষক সর্বদা আর্থিক অনটনের সম্মুখীন হয়।

১৫.৩.২ **অর্থ** ঃ সাধারণ কৃষকেরা চাষবাস করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে প্যারেন না। যাঁদের সংগতি আছে তাঁদের সমস্যা নেই। কিন্তু যাঁদের সংগতি নেই তাঁদের অত্যন্ত চড়া সুদে অর্থ সংগ্রহ করতে হয়। অনেককে জমি বিক্রি করে ঋণ পরিশোধ করতে হয়।

১৫.৩.৩ **ধারাবাহিকতা ও মনোভাব** ঃ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, বিশেষ করে ভারতের লোকেরা পুরান ধারাকে আঁকড়ে থাকতে চান। প্রবীণ কৃষকেরা উন্নত প্রযুক্তিকে গ্রহণ করতে আগ্রহী নন। এখনও বর্তমান সমাজব্যবস্থায় প্রবীণরা মতামতের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেন। যার জন্য নবীনেরা ইচ্ছা থাকলেও প্রধানদের বিরোধিতা করতে পারেন না। তাছাড়া প্রগতিশীল মনোভাব অধিকাংশ কৃষকের নেই। আজও অধিক ফলনশীল ধান শতকরা ৩০ ভাগ জমিতে প্রবেশ করতে পারেনি।

১৫.৩.৪ **জ্ঞান** ঃ প্রবীণ কৃষকেরা যাঁরা এখনও জমির উপর আধিপত্য বিস্তার করে আছেন তাঁরা নিজেরা যেটা ভাল মনে করেন তা থেকে সরে আসতে চান না। তাঁদের অজ্ঞানতাকে তাঁরা মেনে নিতে চান না। আধুনিক প্রযুক্তি তাঁদের আকর্ষণ করে না।

১৫.৩.৫ **উৎপাদন সহায়ক বস্তুর অপ্রতুলতা** ঃ উন্নত প্রযুক্তিকে গ্রহণ করতে অনেকেই আগ্রহী ; কিন্তু সময় মত সার বীজ বা ওষুধ ইত্যাদি পাওয়া যায় না। আবার যা পাওয়া যায় তা ভেজাল অথবা দাম বেশী। এইসব কারণে অনেকে বাধ্য হয়ে পুরান পদ্ধতি গ্রহণ করেন ও ফলন কম পান।

১৫.৩.৬ **সংগঠন** ঃ প্রতিটি উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানের জন্য সংগঠন আছে। কিন্তু কৃষিকাজে লিপ্ত কর্মীদের কোন সুসংহত সংগঠন নেই। তাছাড়া সরকারী পরিচালকবর্গও কৃষিতে উৎসাহ দান করতে সংকোচ বোধ করেন। প্রশাসনিক উৎকর্ষও এমন নয় যে কৃষকেরা উন্নত-মানের কৃষিকার্য করতে উৎসাহিত হন।

১৫.৪.১ ফলন বৃদ্ধির প্রয়োজন আছে কি ?ঃ অধিকাংশ দেশ বিশেষ করে যেখানে জনসংখ্যা বেশী সেখানে ধান হচ্ছে মূল খাদ্য এবং একথাও সত্য যে ওই সব দেশের জনসংখ্যার হার আনুপাতিক ভাবে অন্য থেকে বেশী। এই হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে এবং বর্তমানে যে চালের উৎপাদন হচ্ছে তা চলতে থাকলে আগামী দিনে ভারতসহ অনেক দেশের সাধারণ লোকজন অপুষ্টি ও অনাহারে মারা যাবে। তাই সকল স্তরের কর্মীদের (বিজ্ঞানী, সম্প্রসারণ কর্মী, প্রশাসক, কৃষক ও আপামর জনতা) চিন্তা করা দরকার, কি করে এই জনসংখ্যার প্রয়োজনীয় চালের চাহিদা মেটান যায়।

১৫.৪.২ উৎপাদন বাড়ান কিভাবে সম্ভব ?ঃ

(ক) চাষ এলাকার সম্প্রসারণ।

(খ) হেক্টর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি।

বর্তমান অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গে ধান চাষের এলাকা বৃদ্ধির সম্ভাবনা নেই। সেই কারণে হেক্টর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে নজর দিতে হবে। আগামী দিনের দিকে তাকিয়ে এখন থেকেই ফলনের ২নং ফাঁক ভরাবার জন্য চেষ্টা করা আশু প্রয়োজন।

১৫.৪.৩ কোন্ দিকে নজর দেওয়া চাই ?ঃ

১। সেচবিহীন এলাকায় বৃষ্টি নির্ভরশীল অধিক ফলনশীল প্রজাতির উদ্ভাবন।

২। পরিবেশের সাথে সঙ্গতি রেখে বিভিন্ন এলাকার জন্য উন্নত চাষ পদ্ধতির আবিষ্কার।

৩। রোগ-পোকা ও অন্যান্য অসুবিধা প্রতিরোধ করার ক্ষমতাযুক্ত প্রজাতির উদ্ভাবন।

৪। জলের সুষম ব্যবহার ও সেচব্যবস্থার সম্প্রসারণ।

৫। ফসল পরিক্রমার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এক ফসলী, দু' ফসলী বা বহু ফসলী ফসল চক্রের জন্য বিভিন্ন প্রজাতি ব্যবহার করা সম্বন্ধে শক্তিশালী প্রচার ব্যবস্থার প্রচলন অবশ্যই করা দরকার।

পরিশিষ্ট

বিশ্বের ধানের এলাকা, উৎপাদন ও ফলনের মাপকাঠি

(১৯৭৮-’৮০-র গড়)

স্থান	উৎপাদন		এলাকা		ফলন
	০০০ টন	মোট উৎপাদনের %	০০০ হেক্টর	মোট এলাকার %	(টন/হেক্টর)
চীন	১,৪০,০০১	৩৬·২	৩৪,৪০০	২৩·৯	৪·১
তাইওয়ান	৩,১৮১	০·৮	৭০৪	০·৫	৪·৫
জাপান	১৪,২৯১	৩·৭	২,৪৭৪	১·৭	৫·৮
উঃ কোরিয়া	৪,৩৩৩	১·১	৭৭৩	০·৫	৫·৬
দঃ কোরিয়া	৬,৯৭২	১·৮	১,২৩২	০·৯	৫·৭
ব্রহ্মদেশ	১০,৫৭৮	২·৭	৪,৭৫১	৩·০	২·২
ইন্দোনেশিয়া	২৭,২৭৬	৭·১	৮,৯১৭	৬·২	৩·১
কামপুচিয়া	১,৩৫৬	০·৪	১,৩০৭	০·৯	১·০
লাওস	৯৭৩	০·৩	৬৯০	০·৫	১·৪
মালয়েশিয়া	১,৮৯৪	০·৫	৬৮০	০·৫	২·৮
ফিলিপিনস্	৭,৮৮৫	২·০	৩,৫২১	২·৪	২·২
থাইল্যাণ্ড	১৭,২৫৩	৪·৪	৯,৪৪৯	৬·৬	১ ৮
ভিয়েতনাম	১০,২০৭	২·৬	৫,৪০৭	৩·৭	১·৯
বাংলাদেশ	১৯,৯৫২	৫·২	১০,২৩৩	৮·১	১·৯
ভারত	৭৪,৭৭০	১৯·৩	৩৯,৭৯৪	২৭·৬	১ ৯
নেপাল	২,২৮৮	০·৬	১,২৫৭	০·৯	১·৮
পাকিস্তান	৪,৭৮০	১·২	১,৯৯১	১·৪	২·৪
শ্রীলঙ্কা	১,৯৪১	০·৫	৭৮৪	০·৫	২ ৫
পশ্চিম এশিয়া	২,১৪১	০·৬	৬৪৬	০·৪	৩·৩
উত্তর আফ্রিকা	২,৪৭০	০·৬	৪৩৩	০·৩	৫·৬
উপ সাহারা-আফ্রি.	৫,৭৬৩	১·৫	৪,১৫০	২·৯	১·৪
পশ্চিম আফ্রিকা	২,৯৬০	০·৮	২,৩৩৮	১·৬	১·৩
মধ্য ও পূর্ব আফ্রি.	২,৮০৩	০·৭	১,৮১২	১·৩	১·৫
ইউরোপ	১,৯০৭	০·৫	৩৭৯	০·৩	৫·০
সোভিয়েত দেশ	২,৪২৯	০·৬	৬১৯	০·৪	৩·৯
লাঃ আমেরিকা	১৫,২১৭	৩·৯	৮,২২৮	৫·৭	১·৮
ব্রাজিল	৮,৭২১	২·২	৬,১৬৯	৪·৩	১·৪
যুক্তরাষ্ট্র	৬,২১৮	১·৬	১,২৩৫	০·৮	৫·০
অন্যান্য	৭,১৮৪	১·৯	২,১৬৯	১·৫	২·২
মোট	৩৮৬,৪৩৪	১০০·০০	১৪৪,১৬৪	১০০·০০	২·৭

উৎস : এ. প্যালাপ্যাক্ (১৯৮২) ওয়ার্ল্ড রাইস স্টাটিসটিক্স্, ইরি, ফিলিপিনস্